ইসলাহী বয়ান

‘সঙ্গ গুণে রঙ্গ ধরে’

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানীতে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার উদ্যোগে জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় মাসিক শবগোযারীর আমল চালু হয়েছে। হারদূঈ হযরতের দুই বিশিষ্ট খলীফা হযরত মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. ও হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান দা.বা. কে কেন্দ্র করে এ মজলিসের সূচনা। এই দুই হযরতসহ জামি‘আর অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরাম উক্ত মজলিসে ইসলাহী বয়ান ও অন্যান্য মা‘মূলাত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। মজলিসটি জামি‘আর নিয়মিত ব্যবস্থাপনা দাওয়াতুল হকের ‘মাসিক মজলিসে আইম্মায়ে মাসাজিদ’-এর আগের রাতে বাদ ইশা হতে শুরু হয়। আগত মেহমানদের জন্য জামি‘আর পক্ষ হতে থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হয়। জামি‘আ কর্তৃপক্ষ উক্ত ইসলাহী মজলিসে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ বিশেষত আবনায়ে রাহমানিয়ার উপস্থিতি কামনা করে।

নিম্নোক্ত বয়ানটি গত ১৯ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. কর্তৃক শবগোযারীর মজলিসে প্রদত্ত।

হামদ ও সালাতের পর...

বুযুর্গানে মুহতারাম,

আমরা সবাই দীন অর্জন করতে আগ্রহী। দীন অর্জন করার জন্য এবং দীনের উপর টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে জরুরী জিনিস হল সোহবত। সোহবত মানে সাহচর্য, সংস্পর্শ। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বহু উত্তম গুণের ধারক ছিলেন। কিন্তু এতো এতো গুণাবলীর কোনটি দ্বারাই তাদের নামকরণ করা হয়নি। বরং তারা যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে থাকতেন, তার সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন এটাকে কেন্দ্র করেই তাদের নাম হয়েছে সাহাবী। সাহাবী শব্দটি একবচন। বহুবচনে, সাহাবা। সাহচর্য স্বাভাবিক হলে বলা হয় ‘সাহিব’। কিন্তু তারা রাসূলের এত বেশি সাহচর্য লাভ করেছিলেন যে, তাদেরকে সাহিব বললে বেমানান হয়। এজন্য তাদেরকে বলা হয় সাহাবী। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম হল, অক্ষর বেশি হলে অর্থও বেশি হয়। (আরবী লেখন পদ্ধতিতে) ‘সাহিব’ এর তুলনায় ‘সাহাবী’ শব্দে অক্ষর বেশী। সুতরাং সাহাবী শব্দে সোহবতের প্রাবল্য আছে।

সাহাবায়ে কেরামের এতো এতো গুণাবলী থাকার পরও এ নামে তাদের নাম রাখা হয়েছে এ কথা বোঝানোর জন্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত দীন অর্জন করার ও দীনের উপর টিকে থাকার নিখাঁদ ও নির্ভেজাল পন্থা হল সোহবত। ইলম অনেকভাবে অর্জন করা যায়; কিতাব পড়ে, মাদারাসায় পড়ে, তাবলীগে গিয়ে, খানকায় গিয়ে। কিন্তু সেই ইলমকে আমলে আনার জন্য সোহবত দরকার। শুধু জানলে আমল করা যায় না। আমল করার জন্য রূহানী শক্তির প্রয়োজন হয়। মানুষ যখন কোন খাঁটি আল্লাহওয়ালাকে মহব্বত করে, তার মজলিসে বসে তখন এই বসার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ইলমও দান করেন, আমল করার জন্য রূহানী শক্তিও দান করেন। পক্ষান্তরে সোহবত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় ইলম হয়তো আসে; কিন্তু সে ইলমের ওপর আমল করা বেজায় কঠিন। মোটকথা সোহবত দ্বারা ইলমও আসে, আমলও সহজ হয়ে যায়। সব যুগেই এর ধারা চালু ছিল। আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যাওয়ার ভিত্তি স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাহাবায়ে কেরাম সব সময় তাঁর সোহবতে পড়ে থাকতেন। সময় পেলেই তাঁরা নবীজীর সান্নিধ্যে চলে আসতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরাম যেখানেই ছিলেন এ মজলিস কায়েম করতেন। হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি. লোকদেরকে ডাকতেন– اجلس بنا نؤمن ساعة (আমাদের সাথে বসো। আমরা ঈমানী আলোচনা করি। ঈমানকে মযবুত করি)। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৩৪৬৯৮)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই মজলিসের ধারা বিশেষভাবে জারি রেখেছিলেন হযরত আলী রাযি.। তার থেকে হযরত হাসান বসরী রহ.। এভাবে চলতে চলতে যুগে যুগে মাশাইখগণ সোহবতের এ মুবারক ধারা চালু রেখেছেন।

হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা যে দাওয়াতের কাজ চালু করেছেন, এখানেও কিন্তু গভীরে গেলে ঐ সোহবত জিনিসটা আছে। যে পরিবেশে দীন নষ্ট হচ্ছে ঐ পরিবেশ থেকে বের করে লোকজনকে ভালো পরিবেশে নেয়া হচ্ছে। সবাই এখানে আল্লাহর জন্য আসছে। এখানেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভালো লোক আছে। আল্লাহওয়ালা লোক আছে। তো দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের এই যে বরকত ও সাফল্য– অন্তর্নিহিতভাবে এখানেও কিন্তু ক্রিয়াশীল ঐ ভালো লোকগুলোর অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সোহবত। একজন মানুষ যখন চার চারটি মাস ভালো মানুষের সোহবতে থাকে বা এক চিল্লা-চল্লিশ দিন সোহবতে কাটায়, আল্লাহ তা‘আলা তার ঈমান ও আমলের মধ্যে অভূতপূর্ব এক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেন।

আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক জিনিসের জন্য নিয়ম ও মাধ্যম রেখেছেন। মানুষের যিন্দেগীতে দীন আসার মাধ্যম হল সোহবত গ্রহণ। এজন্য আমরা এটাকে অপরিহার্য করে নিই। প্রতি মাসে একবার, অন্তত তিন মাসে একবার হলেও কোন আল্লাহওয়ালার সোহবতকে গনীমত মনে করতে হবে। ইবলিস আমাদেরকে ধোঁকা দিবে, বাধা দিবে; সোহবতে যেতে দিবে না। যখনই মানুষ সোহবত গ্রহণে আগ্রহী হয়, শয়তান তার সামনে নানা অজুহাত পেশ করে। বিভিন্ন প্রয়োজন ও ঝামেলা তুলে ধরে যে, সোহবতে গেলে এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। অথবা যার সোহবতে যাওয়ার ইচ্ছা করে ইবলিস তার কিছু ত্রুটি দেখায় আর বলে, এর কাছে গিয়ে আর কী শিখবে, এরই তো এই ভুল সেই ভুল?! শয়তান এগুলো বলে মানুষকে নেককারদের সোহবত থেকে বঞ্চিত করার জন্য। এগুলো শয়তানের হাতিয়ার। এজন্য কারও সোহবতে যেতে হলে যারা হাজার রকম গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য তালাশ করে তারা মাহরূম হয়। তবে যেটুকু দেখার– তা হল, কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ তাকে ইজাযত দিয়েছেন কিনা? মানুষ তো আর নবী কিংবা ফেরেশতা নয়। মানুষের ভুল-ভ্রান্তি থাকেই। আল্লাহ সেটা বুঝবেন। সেটা বোঝার দায়-দায়িত্ব আমাদের নয়। তবে সম্ভব হলে অবশ্যই খায়েরখাহী ও

কল্যাণকামিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বড়কে তার ভুল থেকে বের করে নিয়ে আসার ফিকির করতে হবে। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলতেন, যারা আমার মু'তাকিদ (ভক্ত), আমি তাদেরকে ভয় পাই। তাদের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকি। আর যারা আমার মুহিব্বীন, আমাকে ভালবাসে আমি তাদের কদর করি, মূল্যায়ন করি। কারণ, ভক্তরা আসে আমাকে বুযুর্গ মনে করে । তাদের বিশ্বাস মতে আমি সম্পূর্ণ নির্ভুল, নির্দোষ ফেরেশতা গোছের কিছু একটা। কিন্তু কাছে আসার পর যখন আমার কোন মানবীয় ভুল তাদের চোখে পড়ে, পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। বুক চাপড়ে বলতে থাকে, আহ্হা! যা মনে করে এসেছিলাম তা তো পেলাম না। পক্ষান্তরে যারা মুহিব্বীন তারা কখনও এমন আচরণ করেন না। তারা কোন ভুল দেখলে যেভাবেই হোক মুরুব্বীকে তা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এটা তাদের মহব্বতের আলামত। তারা আমাকে ভুল থেকে বের করে আনবেন ঠিক; কিন্তু ছেড়ে চলে যাবেন না।

আবূ আব্দুল্লাহ আন্দালূসী রহ.। অনেক বড় আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ। একবার তার জীবনে বড় এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তিনি ছিলেন যামানার সবচেয়ে বড় পীর। বাগদাদে তার শানদার খানকা। জুনায়েদ বাগদাদীর শাইখ ও পীর। কিন্তু তিনি এক খ্রিস্টান মেয়ের প্রতি আশেক হয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মেয়ের বাবা শর্ত দিল, বিয়ে দিতে পারি তবে আমার শুকরগুলো চরাতে হবে এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। এদিকে তিনি কুরআনের হাফেয ছিলেন। সব আয়াত ভুলে গেলেন। শুধুমাত্র একটি আয়াত মনে ছিল– وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. (আল্লাহ যদি কাউকে অপদস্থ করেন তাকে ইজ্জত দানকারী আর কেউ নেই)। (সূরা হজ্জ- ১৮)

হাজার হাজার হাদীস জানতেন; সব ভুলে গেলেন। মনে রইল শুধুমাত্র একটি হাদীস– من بدل دينه فاقتلوه (যে মুরতাদ হয়ে গেছে, ধর্মত্যাগ করেছে তাকে কতল করে দাও)। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩০১৭)

তখন জুনাইদ বাগদাদী রহ. সহ আরো যারা তার মুরীদ ছিলেন তারা কি তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন? না তারা চলে যাননি। শাইখের পিছনে লেগে ছিলেন। তারা তাকে বুঝাচ্ছিলেন আর আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছিলেন। মুরীদদের কান্নাকাটির জবাবে তিনি শুধু বলছিলেন, বাবা! আমার ভেতর থেকে কী যেন একটা উড়ে গেছে। আসল ঘটনা হল, কিছু লোককে মূর্তির সামনে সিজদায় পড়ে থাকতে দেখে তার দিলের মধ্যে এই ভাবনা এসেছিল যে, এদের মত নির্বোধ আর আল্লাহর যমীনে নেই! নিজেই খোদা বানাল, আবার নিজেই তার সিজদা করল! হায় রে আহাম্মকি! এভাবে অন্যকে মনে মনে হেয় করার কারণে, তুচ্ছজ্ঞান করার কারণে তার সীনা থেকে ঈমান বের হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে এক অগ্নিপরীক্ষা। আল্লাহ তাকে দেখাতে চাইলেন, ঈমান কারও বাহুবলে অর্জিত জিনিস নয়; এটা আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ ও দয়া। তিনি যাকে ইচ্ছা তার দয়ার ছায়াতলে স্থান দেন, যাকে ইচ্ছা বের করে দেন। যা হোক, এক বছর পর আল্লাহ তা'আলা তাকে তার ঈমান ফিরিয়ে দিলেন। তিনিও পূর্বের মত বরং আরও ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলেন। মুরীদদের কান্নাকাটির ফলাফল লক্ষ্য করুন! সুতরাং কেউ অন্যায় করলে তাকে অন্যায় থেকে বাঁচাতে হবে। তাকে বেইজ্জত করা হারাম।

আমার শাইখ মুহিউস সুন্নাহ হযরত হারদুঈ রহ. একবার কুতবুল আলম শাইখ যাকারিয়া রহ.-কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর! থুতনির নিচের বাচ্চা দাড়ি সম্পর্কে মাসআলা কী? রাখতে হবে, না কাটা যাবে? কুতবুল আলম শাইখ যাকারিয়া রহ. বললেন, রাখতে হবে। তবে দু-একটা যদি বাঁকা হয়ে মুখের ভিতরে চলে আসে সেটা ছেঁটে দিবে। তখন হারদুঈ রহ. বললেন, হযরত! আপনি তো রাখেন না। কুতবুল আলম বললেন, বাবা! আমি কাটিনি, বরং জন্মগতভাবেই বাচ্চা দাড়ি আমার গজায়ইনি। ঘটনাটি আমি এজন্য বললাম যে, শাইখ হারদুঈ তার উস্তাদের ভক্ত ছিলেন না; মুহিব ছিলেন। ভক্ত হলে তো তিনি ভেগে যেতেন। আমার মতে ভাগনেওয়ালাকেই সংক্ষেপে 'ভক্ত' বলা হয়।

কাজেই মুহিব্বীন থাকলে বড়দের ভুল শুধরে যাবে। অনেক সময় বড় বড় আলেমও পরিবারের পাল্লায় পড়ে ভুল করেন। এসব ক্ষেত্রে খোঁজ নিতে হয়, তার কোন মুহিব্বীন আছে কিনা। থাকলে তাকে দিয়ে শোধরানোর কাজ নিতে হয়। পক্ষান্তরে সবাই যদি ভক্ত হয়, জ্বী হুযূর পার্টি হয়, তাহলে বড় বদ-কিসমত; বড় ক্ষতিকারক। সাধারণত শেষ বয়সে মানুষের আকল কাজ করে না। তখন সে যে ভুল করবে ঐ ভুলের উপরই তার ইন্তিকাল হয়ে যাবে। সেখান থেকে বের করে আনার কেউ থাকবে না। এজন্য দু'আ করো, আল্লাহ যেন আমার সহীহ মুহিব্বীন দান করেন। সহীহ মুহিব্বীন আরশের নিচে ছায়া পাবে। এজন্য প্রয়োজন সোহবত। হাদীসে এসেছে, الجليس الصالح خير من الوحدة অর্থাৎ সৎ সঙ্গী একাকিত্ব হতে উত্তম। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা,নং ৩৪৮১৯)

হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. বলতেন, সঙ্গ গুণে রঙ্গ ধরে। একটি কাঁঠাল পেকে গেলে এর সংস্পর্শে অন্যগুলোও পেকে যায়। এজন্য যারা দূর-দূরান্ত থেকে নৌকায় করে কাঁঠাল আনা-নেয়া করে, তারা আড়তে বা মোকামে পৌঁছার আগে প্রতিদিন বাছ দিয়ে (খাওয়ার বা কাউকে দেয়ার মত না পেলে) পাকা কাঁঠালগুলো নদীতে ফেলে দেয়। কারণ এর সোহবতে বাকিগুলোও পেকে যাবে। মোকাম দূরে হওয়ায় সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমাদের সকলেরই সোহবত অবলম্বন করা উচিত।

দ্বিতীয় আয়াত পড়েছিলাম فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا তোমরা আল্লাহর (গড়া) ফিতরাতকে ধরে রাখো। এখানে الزموا শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ হক কবুল করার যোগ্যতা নষ্ট করো না। আল্লাহ তাআলা প্রথমে বলেছেন, এটা ধরে রাখো। সামনে বলেছেন, لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

অর্থ : আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না। (সূরা রূম- ৩০)

এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটা খবর, একটা সংবাদ। এদিকে মুফাসসিরগণ লিখেছেন, কুরআনে কারীমে যত খবর আছে, যত সংবাদ আছে সবখানে 'ইনশা' (নির্দেশনা) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নিছক ঘটনা বলা বা কোন সংবাদ দেয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। বরং সব সংবাদের বাঁকে বাঁকেই 'ইনশা' অর্থাৎ শিক্ষা ও নির্দেশনা গ্রহণের দাবী থাকে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে এক মুষ্টি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে মাটির মধ্যে যত বাহ্যিক গুণাগুণ, রঙ-রূপ ইত্যাদি আছে সব বনী আদমের মধ্যে এসে গেছে। তেমনিভাবে মাটির যত অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ শক্ত-নরম, উর্বর-

অনুর্বর ইত্যাদিও এসে গেছে। এটা একটা খবর, সংবাদ। মেশকাতের গ্রন্থকার খতীব তিবরীযী (রহ.৭৪১হি.) এই হাদীসটি ঈমান বিল-কদর (তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস) অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন। এই হাদীসের মর্ম হল, মানুষ যে তবিয়ত ও স্বভাব পেয়েছে, রঙ ও রূপ লাভ করেছে সব তার তাকদীর অনুযায়ী পেয়েছে।

এই হাদীসে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ 'ইনশা' অর্থাৎ দিকনির্দেশনা রয়েছে-

(১) কেউ যদি ভাগ্যক্রমে মাটির কোন মন্দ প্রভাব পেয়ে থাকে, শক্ত স্বভাব পেয়ে থাকে তবুও সে মন খারাপ করবে না। সে নিজেকে কোন আল্লাহওয়ালার সোহবতে পেশ করবে। তিনি তাকে ঘষে-মেজে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে দিবেন, আল্লাহর রহমতে তখন তার দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না। কারো ক্ষতি হবে না। উদাহরণত কারো সারাদিন শুধু ব্যভিচার করতে মন চায় (আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন), তাহলে সে এটা কীভাবে দূর করবে? কোন আল্লাহওয়ালার কাছে নিজেকে হাওয়ালা করে দিবে। তিনি তাকে ঘষে-মেজে ঠিক করে দিবেন।

(২) যিনি তা'লীম দিবেন, তরবিয়াত করবেন তার দায়িত্ব হল, সামনে যে ছাত্র আছে সে মাটির কোন তবিয়ত, কোন স্বভাব পেয়েছে তা বুঝতে হবে। সে অনুযায়ী তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এটাকে বলা হয় মুকতাযায়ে হাল (স্থান-কাল-পাত্র বিচারে আচরণ করা)।

যেমন দু'ব্যক্তি মিলে একটি অন্যায় করল। বিচারক একজনকে শুধু বললেন, আপনি এ কাজটি করতে পারলেন! আপনার দ্বারাও এটা সম্ভব হল! আর আরেকজনকে তিনি দশ বেত মারলেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, যাকে বলেছেন– 'আপনি এ কাজটা করতে পারলেন' সে অন্যায় করার পর অনুশোচনায় এক সপ্তাহ ঘর থেকেই বের হয়নি। আর যাকে দশ বেত মারা হয়েছে সে ঐদিন থেকেই লাফালাফি করছে; তার কোন অনুভূতিই নেই। তার অবস্থা গুলিস্তানের সেই চোরের মত যাকে লোকেরা লাথি, ঘুসি, চড়, থাপ্পড় যে যা পারল মারল। যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে গেল তখন চোর উঠে বক্তব্য দিল, 'মানির মান আল্লায় রাখে। এক ছালায় ভী কান ছুইবার পারে নাইক্কা।' অর্থাৎ তার ধারণা হল, যে যত কিল-ঘুষিই দিক কিছু আসে যায় না। কান ধরলেই আর মান রইল না; সব শেষ। বলছিলাম, সকলের তবিয়ত এক হয় না। তাই তা'লীম, তরবিয়াতের সময় ছাত্রের তবিয়তের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কাফেরদের এক নেতা এসেছিল। সে এমন গোত্রের লোক, যারা বাইতুল্লাহয় কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুগুলোর খুব ইজ্জত করত। হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার আগমন সম্পর্কে জানতে পারলেন, সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন (তখন চৌদ্দশত সাহাবা ছিলেন), তোমরা তার সামনে দিয়ে কুরবানীর পশুগুলো লাইন ধরে নিয়ে যাও। এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের তবিয়ত বুঝে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম শুধুমাত্র তার সামনে দিয়ে পশুগুলো নিয়ে গেলেন; তাকে কিছুই বললেন না। তখন সেই লোক কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হলেন যে, হায় আল্লাহ! এই লোকগুলো কুরবানীর জন্য বাইতুল্লাহয় যাবে আর এদেরকে বাধা দেয়া হবে! এদেরকে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না! সে নবীজীর সঙ্গে কোন কথা না বলে কাঁদতে কাঁদতে মক্কায় ফিরে গেল। গিয়ে কুরাইশদেরকে বলল, ভাই! তোমরা এদেরকে ছেড়ে দাও। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তারা কুরবানীর জানোয়ার নিয়ে এসেছে। এদেরকে বাধা দিও না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটু হেকমত করেছেন। লোকটিকে কিছুই বলে দিতে হয়নি। সে নিজেই হুযূরের পক্ষে তাশকীল করতে আরম্ভ করেছে। মোটকথা, এই হাদীসের আরেক নির্দেশনা হল, তবিয়ত বুঝতে হবে। তবিয়ত বুঝে দাওয়াত দিলে মানুষ সহজেই কবুল করবে।

তো বলছিলাম, আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহর দেয়া তবিয়তকে পরিবর্তন করো না। আগের আয়াতে বলা হয়েছে নেক সোহবতে যাবে। আর এ আয়াতে বলা হয়েছে গলত সোহবতে যেয়ো না। না হয় হক কবুল করার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। আটরশি যাওয়া হারাম। যত বাগী আছে দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, কুতুববাগী সবগুলোতে যাওয়া হারাম। এছাড়া আরো যত কিছু দ্বারা মনের মধ্যে বক্রতা আসে এ আয়াতে সব নিষেধ করা হয়েছে। অনেক বয়স্ক লোক আছে যারা সারাক্ষণ মোবাইল টিপতে থাকে, গেইমস খেলতে থাকে। কেউ রিমোট হাতে টেলিভিশনের সামনে পড়ে থাকে। কেউ ফেসবুক চালাতে থাকে। এগুলোতে তবিয়ত নষ্ট হয়ে যায়। ফেসবুক তো 'সাম্মে কাতেল'– প্রাণঘাতী বিষ। প্রায় লোকেরই এ বদ-অভ্যাস আছে। কাজেই গলত সোহবতে যাওয়া যাবে না। টেলিভিশন দেখা যাবে না, ভণ্ডপীরের সোহবতে যাওয়া যাবে না। দুনিয়াবী কোন সভা-সমাবেশ যেখানে দীন কায়েমের কোন কথা হয় না, সেখানেও যাওয়া যাবে না। এরূপ মজলিস সম্পর্কে তো হাদীসে বলা হয়েছে, মরা গাধা খাওয়ার জন্য জমা হয়েছিল, খেয়ে চলে গেল। অনেকে আবার তামাশা দেখার জন্যও যায়। এ আয়াতে সব নিষেধ করা হয়েছে।

মওদুদীর বই পড়া যাবে না। কাদিয়ানীর বই পড়া যাবে না। গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় আমাদের যুগে এক ছাত্র ছিল। প্রখর মেধাবী; সব কিতাব মুখস্থ করে ফেলত। তবে খুব গরীব ছিল। মাদরাসার পক্ষ থেকে তার সকল খরচ বহন করা হত। তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. লালবাগে মুফতী দীন মুহাম্মাদ সাহেব রহ.-এর নিকট তাফসীর পড়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই ছেলেটি কীভাবে যেন বখশিবাজারে কাদিয়ানীদের কেন্দ্রে যাতায়াত করতে লাগল। ক্রমে তাদের সাথে তার সম্পর্ক হয়ে গেল। একপর্যায়ে সে কাদিয়ানীই হয়ে গেল। অথচ সে ঢাকায় এসেছিল আরো ভালো পড়াশোনার জন্য। কিন্তু খারাপ সোহবতের কবলে পড়ে শেষতক কাদিয়ানীই হয়ে গেল। তো খারাপ সোহবতে গিয়ে মানুষ যে কোন সময় মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। ইতিহাসে এমন অনেক দুঃখজনক ঘটনা আছে। বাল'আম বাউর মুরতাদ হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ আন্দালূসী মুরতাদ হয়ে গেল। ফিতনায় পড়ে ভাল লোকও যে কোন সময় মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। কাজেই স্বভাব নষ্ট হতে দেয়া যাবে না। ভ্রান্ত লোকদের বই পড়তে গেলে তাদের মত হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। কেননা তারাও কুরআন দ্বারা দলীল পেশ করেছে। আয়াতের অপব্যাখা করে, ঘাড় মুচড়ে দলীল পেশ করেছে। ওসব মারপ্যাঁচ সবার বুঝে আসবে না; ফলে অপব্যাখ্যাকেই সে সঠিক হিসেবে মেনে নিবে।

বর্তমান যুগের বাচ্চারা মায়ের পেট থেকে বের হয়েই মোবাইলে হামলে পড়ে। মোবাইল পেলেই সব ঠাণ্ডা। কিন্তু এটা তো এই আয়াত পরিপন্থী।

জন্মগ্রহণের পর তার কানে আযান দেয়া হয়েছে, ইকামত দেয়া হয়েছে। কিন্তু এত ছোট অবস্থায়ই তার মোবাইলের নেশা হয়ে গেল! সময় পেলেই টিপতে থাকে! সাপ আসে, ব্যাঙ আসে, আর ওগুলো দেখতে থাকে! এভাবে তার খোদাপ্রদত্ত তবিয়ত নষ্ট হয়ে যায়। তাকে আর মানুষ করা যাবে না। তাকে আর ঠিক করা সম্ভব হবে না। এমনকি মাদরাসায় এসেও লুকিয়ে লুকিয়ে এগুলো দেখতে থাকে। একসময় উস্তাদদের কাছে ধরা পড়ে যায়। আল্লাহ তাকে একটা সময় পর্যন্ত তওবার সুযোগ দেন। তারপর প্রকাশ করে দেন। যে কোন গুনাহ যত গোপনেই করা হোক, আল্লাহ তা প্রকাশ করেই দেন। আল্লাহর এক নাম সাত্তার অর্থাৎ গোপনকারী। আরেক নাম মুবদি' অর্থাৎ প্রকাশকারী। পিতা-মাতা ছোট সময়ে তার তবিয়ত নষ্ট করে দিয়েছে। যার ফলে এখন মাদরাসা থেকে বহিষ্কার হচ্ছে। এরপর আরেক মাদরাসায় ভর্তি হয়। কিন্তু তবিয়ত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আবারও অপরাধ করে। ফলে সেখান থেকেও বহিষ্কার হয়। এভাবে যখন কয়েক মাদরাসা থেকে বহিষ্কার হয় তখন তার পড়ালেখাই বাদ হয়ে যায়। তার যিন্দেগী বরবাদ হয়ে যায়। এটা কেন হল? পিতা-মাতা ছোট সময়ে খেয়াল না করার দরুণ। এর ফলেই এ পরিণতি। আল্লাহ যে বলেছিলেন, আল্লাহর দেয়া স্বভাব নষ্ট করো না। এটা পিতা-মাতার মাথায় ধরে না। কেউ কুরআন-কিতাব না পড়িয়ে বাচ্চাকে ইংলিশ মিডিয়ামে দিচ্ছে। কেউ সেন্ট জোসেফে দিয়ে আসে। এর দ্বারা সে পাক্কা নাস্তিক হয়। মোবাইল দ্বারা বাচ্চা সাময়িক ঠাণ্ডা হল, মায়ের কিছু কষ্ট কম হল। কিন্তু সে তো ধ্বংস হয়ে গেল। এজন্য মোবাইল, ইংলিশ মিডিয়াম, টেলিভিশন এ জাতীয় সবই এ আয়াতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। এসব কিছু থেকেই বেঁচে থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৎসঙ্গ ইখতিয়ার করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের আওলাদদেরকেও অসৎসঙ্গ থেকে বিরত থাকার ও রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : মাওলানা শফীক সালমান
শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
মাওলানা ইসমাতুল্লাহ, শিক্ষার্থী, ইফতা ২য় বর্ষ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

(৩৬ পৃষ্ঠার পর; সুন্নাহ-সম্মত পোশাক)

যেমন ইয়াহুদীদের ছোট্ট টুপি। বুহরা শিয়াদের বিশেষ ডিজাইনের গোল টুপি ইত্যাদি।

পাগড়ী : টুপি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় পাগড়ী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশী। তাঁরা টুপির ন্যায় পাগড়ীও সাধারণ পোশাকের অংশ হিসাবে পরিধান করতেন। শুধু নামাযের সময় পাগড়ী পরা আর নামায শেষে তা খুলে ফেলার প্রচলন সাহাবা-তাবেয়ীদের যুগে ছিল না। পাগড়ীর বিভিন্ন ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সবগুলো যয়ীফ-অনির্ভরযোগ্য।

যে কোন রঙের পাগড়ী পরা যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কালো পাগড়ী পরার বিষয়টি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। পাগড়ীর দৈর্ঘ্য কত হবে সরাসরি তা কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে কেউ সাত হাত এবং কেউ দশ হাতের কথা বলেছেন। পাগড়ীর প্রান্ত পিছনে কাঁধের উপর সর্বোচ্চ এক হাত এবং সর্বনিম্ন চার আঙ্গুল ঝুলাতেন বলে সাহাবায়ে কেরামের আমল বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো প্রান্ত না ঝুলিয়ে পাগড়ী পরেছেন এমনটিও বর্ণিত হয়েছে। আবার উভয় প্রান্ত কাঁধের উপড় দিয়ে পিছনের দিকে ঝুলানোর কথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

রুমাল : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগ কখনো কখনো পৃথকভাবে মাথার রুমাল বা চাদর ব্যবহার করেছেন, কখনো আবার গায়ের চাদর দিয়ে মাথা আবৃত করেছেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন,

كنت ألعب مع الصبيان إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد منع رأسه بثوب فسلم على ثم دعاني فبعثني لحاجة وقعد في ظل حائط.

অর্থ : আমি ছোট বালকদের সাথে খেলা করছিলাম। এমতাবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। তিনি একটি কাপড় দ্বারা মাথা আবৃত করে রেখেছিলেন। তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং ডেকে নিয়ে একটি কাজে পাঠালেন এবং একটি বাগানের দেয়ালের ছায়ায় বসলেন। (মুসনাদে আবূ আওয়ানাহ - ৫/২৪০)

তবে প্রথম যুগে কেউ কেউ মাথায় রুমাল ও শাল ব্যবহার অপছন্দ করতেন। অবশ্য সাহাবা যুগের শেষ দিক থেকেই আলেম ও ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের মাথায় শাল বা রুমাল ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।

(সাত)

নবীযুগে নারীদের পোশাক

নবীযুগে মহিলাগণ শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য সাধারণত ইযার ব্যবহার করতেন। তবে সে যুগে মহিলাদের মাঝে সারাবীল তথা পাজামা সেলোয়ার ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। হজ্জের সময় পুরুষের জন্য পাজামা ব্যবহার নিষেধ করা হলেও মহিলাদের জন্য এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। মূলত মহিলাদের জন্য সারাবীল অত্যন্ত উপযোগী পোশাক। পাজামা পরিধানের উৎসাহ-জ্ঞাপক কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে দুর্বল সনদে বর্ণিত কিছু হাদীসে এর ফযিলত ও উৎসাহ জ্ঞাপক নির্দেশনা বর্ণিত আছে।

উর্ধ্বাংশের জন্য মহিলাগণ পায়ের পাতা পর্যন্ত নামানো ঝুলের কামিস পরিধান করতেন। মহিলাদের এ কামিসকে درع বলা হতো। درع তে সাধারণত কাঁধের দিকে ফাড়া থাকে। পুরষগণ ইযারের সাথে যেরূপ খোলা চাদর ব্যবহার করতেন, মহিলাগণ সাধারণত সেরূপ খোলা চাদর ব্যবহার করতেন না। তারা কামিস ব্যবহার করতেন। তাদের এ কামিস ফুলহাতা বিশিষ্ট হতো। মাথা, চুল, গলা, কাঁধ, কান ইত্যাদি আবৃত করার জন্য তারা ওড়না ব্যবহার করতেন। আরবীতে একে خمار খিমার ও قناع বলা হয়। তা পাতলা বা সঙ্কীর্ণ হতো না। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

إنما الخمار ما وارى الشعر والبشر.

অর্থ : ওড়না তো তাকেই বলা হবে, যা চুল ও চামড়া ঢেকে রাখবে। (মুসনাদে আব্দুর রায্যাক ৩/১২৯)

মাথা, মুখ, গলা আবৃত করার জন্য মাথার আকৃতিতে তৈরি পোশাককে برقع বুরকা বলা হতো। তারা মুখাবরণের জন্য বুরকাও ব্যবহার করতেন, আর জনসমক্ষে বের হওয়ার জন্য এসব পোশাকের উপর একটি বড় চাদর পরিধান করতেন যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে রাখত। একে জিলবাব বলা হতো।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : মুফতী ও মুহাদ্দিস, মাদরাসা বাইতুল উলূম ঢালকানগর, গেন্ডারিয়া, ঢাকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা : প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, ব্যর্থতা ও অঙ্গীকার

মাওলানা জহীরুল ইসলাম

স্বাধীনতার মূল্য

স্বাধীনতা মহান আল্লাহর অপূর্ব দান। এর জন্য শোকর আদায় করে শেষ করা যায় না। স্বাধীনতা যে কত বড় একটি নিয়ামত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধরাই কেবল তা অনুধাবন করতে পারেন। পরাধীনতা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জনের পথেও অনেক বড় বাধা। পরাধীন মানুষ প্রায়শই একান্তে বসে আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হয় না। মহান আল্লাহর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ; তিনি আমাদেরকে স্বাধীনতার অমূল্য নেয়ামত দান করেছেন।

ইসলামে স্বাধীনতার মূল্যায়ন

স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি। মানুষ মনোজগতে সব সময় স্বাধীন; তাই সে বহিঃজগতেও স্বাধীন থাকতে পছন্দ করে। এ কারণেই ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো প্রকার মানবসৃষ্ট পরাধীনতা ইসলাম সমর্থিত নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

অর্থ : যিনি বোঝা নামিয়ে দেন এবং সেই শৃঙ্খল অপসারণ করেন যা তাদের ওপর বিদ্যমান থাকে। (সূরা আরাফ-১৫৭)

ইসলাম স্বাধীনতার প্রতি শুধু উদ্বুদ্ধই করেনি; স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জীবনদানকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা মানে সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা, সত্য গ্রহণের স্বাধীনতা, সত্য প্রচারের স্বাধীনতা, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে চলার স্বাধীনতা, সুকুমারবৃত্তি চর্চার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানে অসুন্দরকে বর্জন ও অসত্যকে অগ্রাহ্য করার স্বাধীনতা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা।

আমাদের স্বাধীনতা : আমাদের প্রাপ্তি

নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতার মহান নিয়ামত পেয়ে ধন্য হয়েছি আমরা। পেয়েছি অসংখ্য ওলি আউলিয়ার পদধুলি ধন্য এ বাংলাদেশ। টানা নয় মাসের মরণপণ লড়াই ও সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের পর সাড়ে সাত কোটি মানুষ পেয়েছে নিজস্ব মানচিত্র। নিজের মতো করে একটি লাল-সবুজ পতাকা। অযুত জনতার আপসহীন মনোভাব ও বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবে বিশ্ববুকে অধিষ্ঠিত। এ এক অনন্য পাওনা। স্বাধীনতার দাবীতে যে সব দেশের জনগণ যুগের পর যুগ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, দমন-নিপীড়নে যাদের জীবনীশক্তি তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তারা জানেন এর মূল্য কত! আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদীরা অনেক কিছু নিয়ে গেলেও আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি। আমরা একটি সংবিধান পেয়েছি। পেয়েছি একটি স্বাধীন সরকার। নিজেদের দেশ নিজেরা পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছি। পেয়েছি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুন্দর এক বাংলাদেশ।

আমাদের প্রত্যাশা

স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে যারা সেদিন অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম একটি বাংলাদেশ পাব। যেখানে কারো তাবেদারী থাকবে না। গড়ে উঠবে বৈষম্যহীন সুদৃঢ় ঐক্যের বাংলাদেশ। থাকবে না রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। থাকবে অর্থনৈতিক সুদৃঢ় ভিত্তি। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আমরাও এগিয়ে যাবো অন্যদের সঙ্গে সমভাবে। সুসম্পর্ক থাকবে প্রতিবেশী দেশের সাথে। বন্ধু অবয়বে আমাদের কোন শত্রু থাকবে না। এদেশের প্রতি থাকবে না কারও খবরদারি; থাকবে শুধু বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। আমাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য শুধু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়া ছিল না; বরং আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ছিল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হয়েছে? বিগত সাড়ে চার দশকে এসব প্রত্যাশা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে? এককথায় বলতে গেলে কোনটিই পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এত রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নতি ঘটেনি। ক্ষমতার মসনদে বারবার পালাবদল হয়েছে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী মানুষের জীবনে তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। নিষ্ঠুর শোষণ-লুণ্ঠনের শিকার খেটে খাওয়া গরীব মানুষের জীবনে আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। ভূমি সংস্কার ও শিল্প বিকাশ না হওয়ায় দেশে বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প বিকাশের উদ্যোগের অভাব, ভূমি সংস্কার ও কৃষিতে উন্নতির যথোপযুক্ত প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি ও সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী বেপরোয়া শোষণ-লুণ্ঠনের কারণে সাধারণ মানুষের আয় প্রকৃত অর্থে বৃদ্ধি পায়নি। দেশের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি মানুষ ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন।

দারিদ্র্যের কবলে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রধানতম সমস্যা হলো দরিদ্রতা। দরিদ্রতা দূরীকরণে প্রয়োজন সুশিক্ষা ও কর্মসংস্থান। অথচ স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরেও আমাদের দেশে না খেয়ে দরিদ্রতার কষাঘাতে পিষ্ট হয় মানুষ। জনসমষ্টির ৩৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার চরম নীচে বাস করে।

আমাদের দেশের বহুল জনসংখ্যাকে মনে করা হয় বোঝা। অথচ সাম্প্রতিককালে স্বাধীনতা অর্জনকারী মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের চমক লাগানো পরিবর্তনের মূল কারণই হল, এই দেশগুলো তাদের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পদ মনে করে; বোঝা নয়। এদেশের জনসমষ্টির ২০ ভাগ মানুষ বছরে অন্তত ছয় মাস অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে কোনমতে বাঁচার চেষ্টা করে। প্রতি বৎসর না খেয়ে যে কত মানুষ মারা যায় তার খবর পত্র-পত্রিকা, বেতার-টিভি কিংবা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয় না। সরকারী পরিসংখ্যান, তথ্য গবেষণাতেও এরা স্থান পায় না। এই গরীব ও শোষিতের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হচ্ছে, ভূমিহীন ও মজুরশ্রেণী। এদের একাংশ পরের জমিতে বর্গাচাষী হিসেবে কাজ করে আর বিরাট অংশ ক্ষেতমজুর বা দিনমজুর হিসেবে অথবা অন্য কোনোভাবে কঠোর মেহনত করে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়। বেকারত্ব তাদের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। জীবনধারণ উপযোগী মজুরী পর্যন্ত তারা পায় না। কারণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ গ্রামীণ মহাজন ও এনজিওদের নির্মম শোষণের শিকার। তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদ ও আমলা পুঁজির কারসাজির ফলে কৃষকরা ফসলের

ন্যায্য দামও পায় না। এভাবে বাজার শোষণের ফলে সকল শ্রেণীর কৃষক, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর ও সাধারণ মানুষ শোষিত হচ্ছে। অপরদিকে দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতির দরুণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে বাস করছেন নিম্নআয়ের মানুষ। বাড়ছে আয়-বৈষম্য। সাধারণ জনগণের জীবনে নিশ্চয়তা নেই অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের। এদেশের শতকরা ৯০ জন শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর ও অন্যান্য মেহনতী মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করেও দু'বেলা পেটপুরে খেতে পায় না। শোষণ আর অনুন্নয়ন থেকে সৃষ্ট ক্ষুধা-দারিদ্র্য-বঞ্চনা-মৃত্যু তাদের নিত্য সাথী। এহেন অবস্থায় দেশের শ্রমজীবী মানুষ শোষণ-লুণ্ঠন-দুর্নীতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করছে। মানুষ চায় পরিবর্তন। গোটা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন। যা প্রয়োজন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে। প্রয়োজন দেশের শতকরা ৯০ জন মানুষের বেঁচে থাকার স্বার্থে। প্রয়োজন এমন এক পরিবর্তন যা সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের অবসানসহ শোষণ-লুণ্ঠন-দুর্নীতি-অনিয়মের রাজত্বের মূলোচ্ছেদ করে কৃষি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন প্রগতিশীল পদক্ষেপ দৃশ্যমান করবে। প্রতিষ্ঠিত করবে জনগণের শিল্প বিকশিতকরণ ব্যবস্থার। এ পরিবর্তন আজ সামাজিকভাবে অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিয়েছে। ক্ষুধাপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষণ-লুণ্ঠন-দুর্নীতি জর্জরিত মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট সমগ্র জাতি

বাংলাদেশ পাকিস্তানের বৈষম্যের অক্টোপাস থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান হবে– এটিই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবতা হল, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে সরকারীভাবে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি। কলকারখানা পাকিস্তান আমলে যা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে এখন অনেকগুলো বন্ধ প্রায়। দেশের যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে তা প্রাইভেট সেক্টরের কারণে হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ সম্পদের মালিকানা চলে গেছে অল্প কিছু পুঁজিপতির হাতে। পাশাপাশি এক শ্রেণীর অসাধু লোক ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, কেউবা শেয়ার বাজার, এমএলএম কোম্পানী, এনজিও সোসাইটি, মাইক্রো ক্রেডিট বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে চলেছে। বৈদেশিক মুদ্রার আয় আমাদের রাজস্ব আয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অথচ যারা কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাচ্ছেন তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও অদক্ষ শ্রমিক। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অদক্ষতার কারণে দেশের বাইরের কাজের পরিধিও খুব একটা বাড়ছে না। এ অবস্থার উন্নয়নে সরকারের বাস্তব কোনো উদ্যোগ আছে কিনা, তাও দৃশ্যমান নয়। ফলে এদেশেরই হাতে গোনা কিছু লোক চরম বিলাসিতায় দিন যাপন করছে। রাজধানী ঢাকা শহরে যেখানে কয়েক লক্ষ মানুষ নোংরা অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধময় খুপরিতে বাস করে, সেখানে এরা বাস করে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায়। ঘর তাদের বিলাসী দ্রব্যে ভরপুর। যে দেশের জনগণের একটা বড় অংশ প্রতি রাতে ক্ষুধাপেটে ঘুমাতে যায়, সে দেশেই সৌখিনতা, বিলাসিতা, বিদেশে প্রমোদ ভ্রমণ, বছর বছর নতুন গাড়ী কেনা, বিদেশে শত শত কোটি টাকার সম্পদ পাচার, আর রাতে মদ্যপানে বেহিসাব অর্থের অপচয়কে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনে আগ্রাসন

স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মান ও পাশের হার যতই বাড়ুক তাতে আশান্বিত হওয়ার তেমন কিছুই নেই। কারণ, পুঁজিবাদের কুপ্রভাব এক্ষেত্রেও আগ্রাসন চালাচ্ছে। শিক্ষায় রমরমা বাণিজ্যের বিষয়টি এখন খোলামেলা ব্যাপার। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্সের জন্য লাখ লাখ টাকা ফি নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদেরকে বেশি বেতনে চাকুরীর লোভ দেখানো হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীরা এগুলোর প্রতিই অধিক ঝুঁকছে। অর্থাৎ বাজারমুখী অর্থনীতির হাওয়া শিক্ষাক্ষেত্রকেও গ্রাস করেছে। ফলে শিক্ষকতা ও অন্যান্য মহৎ পেশার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থী কমই থাকছে।

অপরদিকে শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা, শিক্ষকদের বিভিন্ন দলের লেজুড়বৃত্তি, পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর ভিসি নিয়োগে অনিয়ম, ছোটোখাটো বিষয়কে কেন্দ্র করে ধর্মঘট, আন্দোলন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার মত বিষয়গুলো জাতিকে হতাশ করে চলেছে চরমভাবে। এছাড়া অনেক বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট বিক্রি ও শিক্ষার নামে প্রতারণার অভিযোগও শোনা যায় মাঝে মধ্যে। এদিকে আলিয়া মাদরাসাগুলো ইতোমধ্যে ফাযিল ও কামিলের মান আদায় করে নিয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা জেনারেল বিষয়গুলোর প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ছে এবং মাদরাসাগুলো থেকে কুরআন-সুন্নাহ ও ধর্মীয় বিষয়ে দক্ষ আলেম কমই তৈরি হচ্ছে। আর এ ধারার মেধাবীদের সিংহভাগই শেষ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে জেনারেল লাইনে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ের দক্ষ শিক্ষকের অভাব দিন দিন প্রকট হচ্ছে।

রাজনীতিতে রাজতন্ত্র

দেশের রাজনীতি রাজতন্ত্রের ফ্রেমে আবদ্ধ সেই সূচনালগ্ন থেকে। দেশের মানুষ চাতকের মতো তাকিয়ে আছে; কবে যোগ্যতার ভিত্তিতে দেশে জনগণের একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে? কবে কায়েম হবে এমন রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের নেতৃবর্গকে মানুষ অভিশাপ দেয়ার পরিবর্তে ভালোবাসা ও ভালোলাগার জায়গায় স্থান দেবে। শত্রু হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে দেশের জন্য সবাই সবার তরে একযোগে কাজ করবে। এগিয়ে যাবে প্রিয় বাংলাদেশ। কে জানে কবে এমন হবে? কবে আমরা বলতে পারব, এই আমাদের প্রত্যাশিত প্রিয় বাংলাদেশ?

এদেশে বিগত চার দশকে আমাদের রাজনীতির সারকথা বলতে গেলে হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পরস্পরে কাদা ছোড়াছুড়ি, নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা, সন্ত্রাসী ও অস্ত্রবাজদের লালন, ক্ষমতায় বসে দেশকে নিজের সম্পত্তি ভাবা, নির্বাচনকে পেশি শক্তি দ্বারা প্রভাবিত করা, কালো টাকার ছড়াছড়ি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতা ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। মাঝে কিছু সময়ের সামরিক শাসন বাদ দিয়ে বাকি সময় কাগজে-কলমে কথিত গণতন্ত্র থাকলেও মূলত আমাদের দেশে এখনো গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড়ায়নি। কারণ স্বাধীনতার কিছুকাল পরই রাষ্ট্রক্ষমতাকে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে ফেলা হয়েছিল বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে। নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পর থেকে গণতন্ত্রে ধারাবাহিকতা এলেও ক্ষমতা থেকে গেছে বরাবরই এই ব্যক্তি বা ঐ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সংসদ, মন্ত্রীসভাসহ সবকিছুই মূলত পরিচালিত হয়ে আসছে দলীয় প্রধানের খেয়াল-

খুশিতে। এটা গণতন্ত্রের নামে রাজতন্ত্র বা জমিদারী প্রথারই ভিন্ন রূপ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ চিন্তাশীল নাগরিকের ভাবনা হলো, আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর হয়ে রাজনীতি করছেন। এমনটি অব্যাহত থাকলে আমাদের রাজনীতি দুর্বৃত্তায়নের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত।

ধর্মীয় স্বাধীনতা দমন

বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ। তারা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে মিলিয়েই জীবনাচরণ পরিচালিত করে।

এখানকার মানুষের কর্ম ও বিশ্বাস থেকে এখনো ইসলামকে বিদায় করা সম্ভব না হলেও এ চেষ্টা কখনো থেমে থাকেনি। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ নিজ নিজ ধর্ম পালন করবেন– এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এখানে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় প্রতিটি ক্ষেত্রে। মাঝে-মধ্যে মনে হয়, এখানে সংখ্যালঘুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারণ, তাদের আচার-অনুষ্ঠানে কোনো বাধা-বিপত্তি নেই। দেশের প্রধান সঞ্চালকরা মুসলমান হলেও তারা যেন নিজ ধর্মের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। মোটকথা ধর্মীয় ক্ষেত্রে এ দেশের জনগণ রাষ্ট্র কর্তৃক চরম অবহেলার শিকার। জনগণের ধর্মীয় জীবনের উন্নতি ও নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনে এ পর্যন্ত কোনো সরকারই এগিয়ে আসেনি। উল্টো বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণ করে সবকিছুকে সেক্যুলার করার অঘোষিত প্রতিযোগিতাই চলছে। অথচ জনসাধারণের মধ্যে নৈতিকতা ও আল্লাহ-ভীতি জাগ্রত করা ছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মুনাফাখোরি, চাঁদাবাজি ইত্যাদির মতো বড় বড় ব্যাধি যে দূর করা সম্ভব নয় তা এখন আর যুক্তি দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। স্মরণ করতে হয়, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারত বিভাজিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের পৃথক দু'টি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও পাকিস্তান আন্দোলনের একজন তুখোড় ছাত্রনেতা ছিলেন। তিনিও স্লোগান দিতেন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, কায়েম কারেঙ্গে আল-কুরআন'। অর্থাৎ পাকিস্তান প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান ছিল না। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা আদতে ধর্মদ্রোহিতার শামিল।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জিত হওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষতা জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। এমনকি ১৯৭০ এর নির্বাচনী ইশতেহারেও 'কুরআন-সুন্নাহ' বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না মর্মে জাতির কাছে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও পিণ্ডির গোলামী থেকে মুক্তির পর সবকিছুই পাল্টে গেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। যেখানে স্বাধীন দেশের সংবিধানে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন থাকা উচিত ছিল, সেখানে বিশেষ মহলকে খুশি করতে পার্শ্ববর্তী দেশের সংবিধানের আদলে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আমাদের জাতীয় সংবিধান প্রণীত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উপেক্ষিত হয়েছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ও বোধ-বিশ্বাসের বিষয়টি। পরবর্তীতে যদিও গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী আনা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে সংবিধানের সেই পঞ্চম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে রাষ্ট্রীয় সংবিধানকে পরিণত করা হয়েছে দলীয় ইশতেহারে। অথচ একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আবেগ-অনুভূতি উপেক্ষা করা যায় না। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানও তা স্বীকার করে না।

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে ভাবনা

স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরেও আজ আমাদের ভাবতে হয় আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিরাপদ কিনা? কারণ, পার্শ্ববর্তী একটি দেশের অঘোষিত যুলুম অত্যাচার আর ফরমায়েশি নানা আবদার দেশের জনগণকে বিষিয়ে তুলেছে। আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি অলিখিতভাবে এখন তাদের হাতে। তারাই যেন আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। প্রতিনিয়ত সীমান্তবর্তী মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণায় প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিক দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন। এমন আচরণ নিশ্চয় কোনো বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশের হতে পারে না। এ কারণেই আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রটি বন্ধুত্বের প্রশ্নে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সবকিছু মিলিয়ে কার্যত আমরা যেন স্বাধীন দেশের বন্দি নাগরিক। আমরা তো পিণ্ডির গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে এমন স্বাধীনতা চাইনি! চেয়েছিলাম এমন স্বাধীনতা যেখানে থাকবে না কোনো বঞ্চনা ও অধিকার আদায়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন। আমরা চেয়েছিলাম হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বাংলাদেশ। যে দেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে; প্রমাণ করবে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম।

স্বাধীনতার সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা। এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত না হলে একটি রাষ্ট্র পরিগণিত হয় ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে। একটি গণতান্ত্রিক, সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়েই আমদের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রিয় জন্মভূমিকে স্বাধীন করেছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতালিপ্সা, ভ্রান্তনীতি ও অহমিকার কারণে বিজয়ের সাড়ে চার দশক অতিক্রান্ত হলেও সে প্রত্যাশা বরং যৎসমান্যই পূরণ হয়েছে। যখন যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করা উচিত ছিল, তখন ক্ষমতাসীনরা নিজেদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত বা চিরস্থায়ী করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তাই করেছেন। অথচ বিশেষ মহলকে খুশি করার জন্য সংবিধানকে অন্য একটি দেশের সংবিধানের ডুপ্লিকেট কপি বানালেও তা তাদের ক্ষমতাকে নিরাপদ করতে পারেনি। তাই তারা চারবার সংবিধানে সংশোধনী এনেছেন। যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলে দেশের মানুষকে মরণপণ যুদ্ধে ঠেলে দেয়া হয়েছিল দেশ স্বাধীনের পর তা আমলে নেয়নি স্বাধীনতার সোল এজেন্টরা।

স্বাধীনতার মর্ম

স্বাধীনতার অঙ্গীকার হচ্ছে, এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে অন্যায়, অসত্য ও অবিচারের উপর ন্যায় বিচার প্রাধান্য পাবে। যেখানে শোষণ, যুলুম ও বঞ্চনার বিপরীতে ইনসাফ ও ইহসান প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বাধীনতার মর্ম হচ্ছে, ফ্যাসিবাদ রুখে দাঁড়ানো। যালেমকে উৎখাত করা। অরক্ষিত স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা। নিজেদের শাসন করার অধিকার অর্জন করা। স্বাধীনতার অঙ্গীকার হওয়া উচিত, পেছনের সকল জড়তা ও হীনম্মন্যতা

ঝেড়ে ফেলে ঐক্যবদ্ধভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়া। স্বাধীনতার অঙ্গীকার হতে হবে, এমন একটি শক্তির উত্থান ঘটানো এবং এমন গণজোয়ার সৃষ্টি করা যাতে সকল অপশক্তি বিদায় নেয় এবং জাতি তাদের প্রত্যাশার নাগাল পায়। তাহলে দেশ এগিয়ে যাবে। মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে স্থান করে নেবে স্বপ্নের বাংলাদেশ। মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতার অর্জনকে সুসংহত করা ও সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। বলতে দ্বিধা নেই, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এ দেশটি আজ কঠিন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। অতীতে আমাদের আশা ও স্বপ্নগুলোকে পাখা মেলে উড়তে দেয়া হয়নি। বারবার প্রত্যাশার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। তাই এবার আমাদেরকে সজাগ হতে হবে। পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বোপরি সততা, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা, দেশপ্রেম ও ঈমানী চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সকল আগ্রাসী কালোথাবার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে আমাদের সকলকে। সত্যিকার দেশপ্রেমিক সজ্জনদের বুকে অসীম সাহস নিয়ে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকল অপসংস্কৃতি, অরাজকতা, সন্ত্রাসী চক্র, দুর্নীতিবাজ আধিপত্যবাদীদের মোকাবেলায় এবং সত্য প্রতিষ্ঠার কঠিন আন্দোলনে যারা এগিয়ে যাবে তারাই একদিন সফলকাম হবে। কারণ সত্য পথের মযলুম যাত্রীদের কখনো দমিয়ে রাখা যায় না। তিমির রাতের আঁধার শেষে পূর্বাকাশ আলোকোজ্জ্বল হবেই হবে ইনশাআল্লাহ্।

লেখক : প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুন নূর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা; খতীব, ওয়ার্লেস গেইট জামে মসজিদ, মগবাজার, ঢাকা

(১৩ পৃষ্ঠার পর; তালিবুল ইলম সন্তান)

উপার্জনের অপবিত্রতায় যেন সন্তান বঞ্চিত না হয়

অনেক সময় দেখা যায়, মেধাবী ও পরিশ্রমী তালিবে ইলমও বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়া ইলমে দীন অর্জনে স্বাভাবিক আগ্রহ হারিয়ে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এমন ক্ষেত্রে স্বয়ং অনাগ্রহী তালিবে ইলমও তার উন্নাসিকতার কারণ বুঝে উঠতে পারে না। তবে প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ উলামায়ে কেরাম গভীর পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকের অপবিত্র ও হারাম উপার্জন এর জন্য দায়ী হয়। আর বুযুর্গানে দীনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতা হলো, হারাম রিযিক দ্বারা প্রতিপালিত শরীর ও অন্তর ইলমে ওহীর ধারক হওয়ার যোগ্য থাকে না। কাজেই সন্তানের সাফল্যমণ্ডিত জীবন গঠনের জন্য অভিভাবকের উপার্জন হালাল হওয়া অপরিহার্য।

আমরা আগেও বলেছি; আবারো বলছি, সন্তানের শৈশব থেকে বরং আরো আগে থেকেই অভিভাবক সন্তানকে আলিম বানানোর প্রস্তুতিস্বরূপ যাপিত জীবনধারায় দীনদারী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর পরিপূর্ণ অনুশীলন বজায় রাখবেন। এর জন্য কোনো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আলিমে দীনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে পবিত্র ও পরিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করবেন। বিশেষত যে কোনো অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ বা লেনদেন করার পূর্বে তার সাথে সবিস্তার আলোচনা করে সে ব্যাপারে শরয়ী বিধিনিষেধগুলো ভালোভাবে জেনে নিবেন। তেমনিভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক উপার্জন হারাম হয়ে থাকলে দ্রুত তার বিকল্প পন্থা খুঁজে হারাম পথ পরিহার করবেন। মোটকথা, যে কোনো মূল্যে তালিবে ইলম সন্তানকে হারাম রিযিক থেকে বাঁচানো অভিভাবকের ফরয দায়িত্ব। এমনকি হারাম থেকে বাঁচার জন্য বিকল্প পন্থা অবলম্বনে দেরী হলে সে সময়টুকুর জন্য প্রয়োজনে মাদরাসার দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা করে মাদরাসা থেকে কোনোভাবে সন্তানের জন্য খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় এক্ষেত্রে সন্তান অভিভাবকের অবহেলায় মারাত্মক পরিণতির শিকার হওয়ার আশঙ্কা আছে; যার ন্যূনতম পর্যায় হলো, ইলমে দীন থেকে বঞ্চিত হওয়া।

পুনশ্চঃ স্বপ্ন যতো বড় হয় তার বাস্তবায়নও ততো কঠিন হয়। আজ তাগুতীশক্তির হাজারো শয়তানী ষড়যন্ত্রের বিষজালে পরিবেষ্টিত অবস্থায় একে একে দিকপাল উলামায়ে কেরামের বিদায়ে হতবিহ্বল মুসলিম উম্মাহ আদর্শ আলেমদের একটি জামাতের স্বপ্ন দেখে, যাঁরা মরহুম আকাবিরে দীনের যোগ্য উত্তরসূরি হবেন। যাঁরা নিত্যনতুন চাতুর্যপূর্ণ ফিতনার যথার্থ মোকাবিলা করে বিদ'আত ও জাহালাতমুক্ত পরিশুদ্ধ জাতি ও সমাজ গঠন করবেন। সর্বোপরি কুফরীশক্তির চতুর্মুখী আগ্রাসনে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত মুসলিম উম্মাহকে ঈমানী বলে বলীয়ান করে সর্বদিক দিয়ে বিজয়ী করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী থেকে এভাবে ইলমে দীন উঠিয়ে নিবেন না যে, বান্দাদের অন্তর থেকে তা ছিনিয়ে নিবেন। বরং উলামায়ে কেরামকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমে দীন উঠিয়ে নিবেন। একপর্যায়ে যখন পৃথিবীর বুকে কোনো আলেমে দীন অবশিষ্ট থাকবেন না তখন মানুষ অজ্ঞ ও মূর্খদের অনুসরণীয় বানিয়ে নিবে, যাদের কাছে ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে এবং তারা না জেনেই উত্তর দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং উম্মতকেও গোমরাহ করবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১০০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৭৩)

এই হাদীসের আলোকে আকাবির উলামায়ে কেরামের ইন্তেকাল ও তাঁদের মতো যোগ্য উত্তরাধিকারী তৈরির অভাব দেখে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। শঙ্কা জাগে যে, পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পৃষ্ঠপোষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন উলামায়ে দীনের অভাব বোধ করবে না তো! উম্মাহর সন্তানেরা নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় বিশুদ্ধ দীনদারী চর্চার জন্য অনুকূল সমাজ ও পরিবেশ পাবে তো! কাজেই দীনের নিভু নিভু মশাল পুনঃপ্রজ্জ্বলিত করার জন্য এবং পৃথিবীর বুকে ইলমে দীনের বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য একজন উৎসর্গপ্রাণ আদর্শ পিতার বড় প্রয়োজন, যিনি তাঁর কলিজার টুকরো সন্তানকে ইলমে দীনের জন্য উৎসর্গ করবেন এবং নিজেকে আলেমসন্তান গঠনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ওয়াকফ করে জাতিকে প্রকৃত যোগ্য আলেমে দীন উপহার দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অভিভাবকের সকল নেক তামান্না কবুল করুন, সকলকে আলেম সন্তানের আদর্শ পিতা হওয়ার মর্যাদা দান করুন এবং প্রত্যেক পিতার জন্য তার সন্তানকে চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর মাদরাসা , হাজারীবাগ, ঢাকা।

তালিবুল ইলম সন্তানের জন্য আপনারও আছে কিছু করণীয়

মাওলানা সা'দ আরাফাত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন. প্রতিষ্ঠানের ছুটিতে পিতা-মাতার স্নেহডোরে

মাদরাসা খোলা অবস্থায় আসাতিযায়ে কেরাম তালিবে ইলমের পড়ালেখা ও আমল-আখলাকের উন্নতিকল্পে বহু যিম্মাদারী পালন করেন। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকা অবস্থায় সন্তানের সার্বিক অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু সামান্য কয়েকদিনের জন্য মাদরাসা ছুটি হলে আসাতিযায়ে কেরাম কর্তৃক ছাত্রগঠনের এই ধারা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় ছুটির মধ্যে মাদরাসায় অর্জিত শিক্ষাদীক্ষার তত্ত্বাবধান করা না হলে সেগুলো হারিয়ে যায়। এমনকি এমনও হয় যে, ছুটি শেষে সন্তান এমন কিছু শিক্ষা ভুলে গিয়ে মাদরাসায় ফিরে আসে, যেগুলো এতদিনে আসাতিযায়ে কেরাম প্রাণান্তকর চেষ্টা করে শিখিয়েছিলেন। কখনো ছুটির পর নতুন কিছু বদভ্যাস তার আচরণে পরিলক্ষিত হয়, যা তার মধ্যে আগে দেখা যায়নি। এভাবে মূলত তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যা বিহীন ছুটি কাটানোর ফলে আসাতিযায়ে কেরামের সাধিত উন্নতি বিনষ্ট এবং তাঁদের সকল মেহনত বেকার ও নিষ্ফল হয়ে যায়। কাজেই তালিবে ইলমের শিক্ষাদীক্ষা ধরে রাখার জন্য মাদরাসার ছুটিতে অভিভাবকের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যা জরুরী।

বলাবাহুল্য যে, সন্তান মাদরাসায় থাকাকালীন তার তা'লীম তরবিয়তের মূল যিম্মাদার আসাতিযায়ে কেরাম হওয়ায় অভিভাবকের যিম্মাদারী কম থাকে। পক্ষান্তরে মাদরাসা ছুটির সময়ে যেহেতু সন্তানের সব দায়দায়িত্ব অভিভাবকের উপর ন্যস্ত হয় তাই স্বাভাবিকভাবেই এ সময় অভিভাবকের সচেতনতা এবং তত্ত্বাবধান অন্য সময়ের চেয়ে বেশি হতে হবে।

সন্তানের ছুটির দিনগুলোতে অভিভাবক সন্তানের উন্নতির লক্ষ্যে এই কাজগুলো গুরুত্ব দিয়ে করবেন-

১. তা'লীম তরবিয়তের অবস্থা জেনে নেয়া : ছুটিকালীন সন্তানের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বাবধানের জন্য ছুটির আগেই সন্তানের তা'লীম তরবিয়তের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে আসাতিযায়ে কেরাম ও সন্তান থেকে জেনে নেয়া জরুরী। এজন্য ছুটির আগে পর্যন্ত পড়ার পরিমাণ সম্পর্কে এবং পেছনের সবকে ত্রুটি থাকলে সে সম্পর্কে অবহিত হবেন। এমনিভাবে তার সর্বশেষ আমল ও আখলাকের অবস্থা এবং এ ব্যাপারে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে তা-ও জানবেন। এক্ষেত্রে সাধারণত আসাতিযায়ে কেরাম এবং সন্তানের ধারণা ও বর্ণনায় পার্থক্য থাকে। তাই এসব বিষয়ে সন্তান এবং আসাতিযায়ে কেরাম উভয়ের কাছ থেকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে জানা উচিত।

২. আমল আখলাকের দিকে লক্ষ্য রাখা : ছুটিকালীন সময়ে সন্তানের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, এ সময়ে আসাতিযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানহীন থাকায় আমল আখলাকের ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীনতা আচ্ছন্ন করে। এমনকি এই উদাসীনতায় কখনো মারাত্মক কোনো ত্রুটিতে লিপ্ত হওয়াকেও তালিবে ইলমের কাছে সামান্য মনে হয়। তাই সন্তানের স্বাভাবিক উন্নতির ধারা বজায় রাখতে তাকে ছুটিতেও আগের আমল আখলাক বজায় রাখার তাকিদ করতে হবে। বরং চেষ্টা করতে হবে, বাড়ি থেকে মাদরাসায় যাওয়ার সময় যেন সে নতুন কোনো আমল বা আখলাকের অভ্যাস নিয়ে যায়। যেমন, মাদরাসায় পিতামাতা ও আসাতিযায়ে কেরামের আনুগত্য শেখানো হয় এবং ঘরে গিয়ে মাতাপিতার কথা মানার গুরুত্ব বোঝানো হয়। তাই ছুটিতে ঘরে আসার পর তাকে অভিভাবক পুনরায় বুঝিয়ে বলবেন, পিতামাতা কোনো কিছু করতে বা ছাড়তে বললে সে যেন তাঁদের আনুগত্যে অবহেলা না করে। বরং তাকে আরো অতিরিক্ত শেখাবেন, গুরুজনের বলার বা আদেশ করার আগেই কিভাবে তাঁদের উপকার বা খিদমত করতে হয়। এমনিভাবে মাদরাসা থেকে একটি নফল নামাযের অভ্যাস নিয়ে এলে চেষ্টা করতে হবে, যেন আরো একটি নফলেরও অভ্যাস হয়ে যায়। এছাড়া এমনও যদি হয় যে, মাদরাসা ছুটির আগে কোনো নিয়মিত আমল বা আখলাকে ত্রুটি এসে গেছে তাহলে পুনরায় সেই অভ্যাস গড়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণত, আল্লাহ না করুন, মাদরাসায় মিথ্যা বলার বদভ্যাস হয়ে থাকলে ছুটিশেষে মাদরাসায় পাঠানোর আগেই দু'আর সাথে প্রাণপণ মেহনতের মাধ্যমে চেষ্টা করতে হবে, যেন সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস পুনরায় চালু হয়ে যায়। কারণ, কোনো ভালো অভ্যাস বা আমল একবার ছুটে যাওয়ার পর পুনরায় দ্রুত তা শুরু না করলে স্থায়ীভাবে ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এ ব্যাপারে অভিভাবক যেন সামান্যতম অবহেলাও না করেন।

সন্তান যদি মাদরাসায় ফেরার সময় আমল আখলাকের কোনো ত্রুটি বা ঘাটতি নিয়ে যায় তবে তা একদিকে যেমন তার উন্নতির জন্য হতাশাজনক তেমনি আসাতিযায়ে কেরামের দায়িত্বপালনেও তা বাধার সৃষ্টি করে। সর্বোপরি উক্ত তালিবে ইলম ও তার অভিভাবকের প্রতিও আসাতিযায়ে কেরাম বিরক্ত হন, যা তার শিক্ষাজীবনের জন্য ক্ষতিকারকও বটে। কাজেই ছুটিতে পূর্ণমাত্রায় সতর্ক থাকতে হবে, যেন আসাতিযায়ে কেরামের অনুপস্থিতির সুযোগে কোনো মন্দ স্বভাব তার মধ্যে বাসা না বাঁধে। অভিভাবকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে টেলিভিশন দেখা, কম্পিউটার বা মোবাইলে নাজায়েয অডিও-ভিডিও দেখা বা শোনা, রেডিওর নাজায়েয ও বেহুদা অনুষ্ঠান শোনা, হারাম ও মিথ্যা গল্প-উপন্যাস পড়া, দুষ্টু ছেলেদের সাথে অতি মেলামেশা, রাস্তাঘাটে বা পাড়ামহল্লায় বেদীন ফাসেকদের বা অভদ্র-অশিষ্ট ছেলেদের বেহুদা আড্ডা-তামাশা দেখা এবং এ জাতীয় অনর্থক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি থেকে সন্তানকে সতর্ক করে দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্তানের বয়স সাত-আট বছর হয়ে গেলেই তাকে পূর্ণ বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে আত্মীয় ও প্রতিবেশী সমবয়সী মেয়েদের থেকে দূরে রাখতে হবে। কারণ, সর্বগ্রাসী মিডিয়ার ঘনঘোর চক্রান্তে আচ্ছন্ন এই বর্তমান সময়ে সমাজের কোমলমতি শিশুদের মনেও এই বয়স থেকেই প্রেম ভালোবাসার

দুরারোগ্য মরণব্যাধি দানা বাঁধতে শুরু করে। এমনিভাবে এই বয়স থেকেই সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে। অপ্রয়োজনে অবশ্যই ইন্টারনেট ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অভিভাবকের তত্ত্বাবধান ও উপস্থিতিতে ব্যবহার করবে। তাহলে অভিভাবকের উপস্থিতির কারণে সন্তান নাজায়েয ও হারাম বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে যাবে। অভিভাবক চেষ্টা করবেন, তাঁর আবেগপূর্ণ ও দরদমাখা কথায় যেন সন্তান ইন্টারনেটের অপব্যবহার ও তার ক্ষতি বুঝে যায় এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবহারের পদ্ধতিও হাতেকলমে শিখে যায়। মোটকথা, সন্তানের বয়স অনুযায়ী তার মধ্যে যতো মন্দ স্বভাব তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে সবগুলোর ব্যাপারেই পূর্ণ সজাগ থেকে সন্তানকেও সতর্ক রাখতে হবে।

৩. কুরআন তিলাওয়াত এবং সবক ইয়াদ রাখা : ছুটিতে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা এবং মাদরাসার ছুটিপূর্ব পাঠ বা সবকগুলো ইয়াদ করার ব্যাপারে তদারকি করবেন এবং পাঠসংশ্লিষ্ট আরো অতিরিক্ত শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করবেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মাদরাসাছাত্রদের গরিষ্ঠতম সংখ্যক অভিভাবক পার্থিব সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাবিত হওয়ায় এখনো মনে করেন, মাদরাসার ছুটি অবস্থায় পড়ালেখা বা ইলমচর্চার প্রয়োজন নেই। অথচ ইলমে দীন সম্পর্কে এই ধারণা মারাত্মক ভুল এবং অজ্ঞতাপ্রসূত। মূলত একজন আলেমে দীনের জন্য ঈমানের মতোই ইলমে দীনও এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যার চর্চার জন্য কোনো সময় বা স্থান নির্ধারিত নেই। তালিবে ইলম মাদরাসা খোলা অবস্থায় যেমন ইলম অন্বেষণ করবে তেমনি ছুটির মধ্যে ঘরেও বিরামহীন ইলমে দীন চর্চা করবে। কাজেই মাদরাসার ছুটিতে অভিভাবক সন্তানকে মাদরাসায় পঠিত সবকগুলো পুনঃপাঠের তাগিদ দেবেন। কোনো সবক ত্রুটির সাথে পড়ে থাকলে বা তাতে ঘাটতি থাকলে সেটা পূরণ করে নিতে বলবেন। এছাড়া ছুটিতে স্বাভাবিক পড়ালেখার বাইরে তাকে এমনকিছু বিষয়ও শেখাবেন যা তার পাঠ্যবিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষার জন্য অনেক বেশি সহায়ক। প্রতি ছুটিতে ঘরের এই বিশেষ শিক্ষার ধারা তাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অন্যদের চেয়ে অনেকদূর এগিয়ে রাখবে। তাই এ বিষয়ে অভিভাবকের পরিপূর্ণ গুরুত্ব দেয়া জরুরী। এমনকি নিজের ব্যস্ততা বা কোনো অপারগতার কারণে এই উদ্দেশ্যে সময় দিতে না পারলে মসজিদের ইমামের কাছে বা গৃহশিক্ষক রেখে হলেও পড়ার ব্যবস্থা করবেন। তা না হলে সন্তান ইতোপূর্বে মাদরাসায় পঠিত সবকগুলো ভুলে যাবে, যা তাকে অন্য শিক্ষার্থীদের চেয়ে পিছিয়ে দিবে।

৪. ধর্মবিদ্বেষ মুক্ত, শিক্ষামূলক ও বাহ্যজ্ঞান সমৃদ্ধ বই অধ্যয়ন : বর্তমান যুগে একজন আলেমে দীনের জন্য সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান হওয়া কতোটা জরুরী তা সচেতন দীনদার মাত্রই বোঝেন। এই উদ্দেশ্যে আসাতিযায়ে কেরাম তালিবে ইলমদের অবসর সময়ে দীনী ও শিক্ষামূলক বই অধ্যয়নের জন্য উৎসাহিত করলেও মাদরাসা খোলা অবস্থায় তালিবে ইলমরা মূলত সেভাবে অবসর পায় না। অপরদিকে ছুটির সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চাপ না থাকায় এ সময়টায় বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার ফুরসত পাওয়া যায়। তাই অভিভাবক এ সময়ে তাকে বয়সের সাথে মানানসই বিভিন্ন বিষয়ের বইপত্র অধ্যয়ন করাবেন। বিষয়বস্তু ও বইয়ের ধরন নির্বাচনে তার আসাতিযায়ে কেরাম বা বিজ্ঞ রুচিশীল কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করে নিলে বেশি উপকার হবে।

৫. অর্জিত ইলম অন্যদের শেখানো ও সংশোধনের অভ্যাস : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্জিত দীনী ইলম পরিবার, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের শেখানোর অভ্যাস করাবেন। তার মনে একথা গেঁথে দিবেন যে, সে তার আশপাশের মানুষের জন্য নমুনা বা আদর্শ হয়ে গেলে তার দেখাদেখি অন্যরাও ভালো এবং পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, যে তালিবে ইলম ছাত্রাবস্থায় অর্জনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের অপূর্ণতা নিয়ে কওমী মাদরাসা থেকে শিক্ষাসমাপন করে তার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা পরবর্তীতে সারাজীবনের চেষ্টা-সাধনায়ও দূর হয় না। এজন্য অভিভাবক সন্তানকে একপ্রকার বাধ্য করবেন, যেন সে পরিবার, সমাজ বা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তার শিক্ষার বিপরীত ভুল বিষয়, গর্হিত কাজ বা কোনো কুসংস্কারের প্রচলন দেখলে হিকমতের সাথে তাদের ভুল সংশোধন করায় এবং সঠিক মাসআলা অনুযায়ী আমলের প্রচলন ঘটায়। এতে সন্তান এখন থেকেই অর্জিত ইলমের দাওয়াত পৌঁছানো ও সমাজ সংস্কারের কাজে আগ্রহী ও অভ্যস্ত হবে। এ রকম ক্ষেত্রে আগ্রহী সন্তানকে অন্যায়ভাবে থামিয়ে দেয়া, বারণ করা বা তাকে ধমকানো প্রকারান্তরে তার উন্নতি ও অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর শামিল। কেননা এতে সে আজীবনের জন্য এই ভালো অভ্যাস থেকে বিরত ও বঞ্চিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে আর কখনো তার পরিপার্শ্ব সংশোধনে আগ্রহী হয় না। কাজেই অভিভাবক এবং পরিবার অবশ্যই এক্ষেত্রে সন্তানের সহযোগী হবেন এবং তাকে এই ভালো অভ্যাসে অভ্যস্ত করার সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন।

৬. দীনী মজলিস-মাহফিলে উপস্থিতি : অভিভাবক বুযুর্গানে দীনের মজলিস-মাহফিলে গেলে সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যদিও নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, সন্তানের জন্য তার অভিভাবকের দরদভরা উপদেশ ও সংশোধন সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়। তথাপি অভিভাবক কোনো দীনী মাহফিলে অথবা কোনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত বা তার মজলিসে শরীক হওয়ার জন্য যাওয়ার সময় সন্তানকে সাথে নিয়ে গেলেও অনেক ফায়দা হয় এবং সে অভিভাবককে দেখে দেখে আল্লাহওয়ালাদের মহব্বত করতে এবং তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখতে শেখে।

৭. যথাসময়ে উপস্থিতি : মাদরাসা কর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখে অভিভাবক অবশ্যই নিজ দায়িত্বে সন্তানকে মাদরাসায় উপস্থিত করবেন। যেহেতু সন্তানের মতো অভিভাবকও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আইনকানুন ও ব্যবস্থাপনা মানার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ তাই যতই গুরুতর সমস্যা বা প্রয়োজন থাকুক না কেন সন্তানকে নিয়মানুযায়ী মাদরাসা খোলার নির্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত করা জরুরী। অন্যথায় তার অনুপস্থিতির সময়ে সহপাঠীরা পড়ালেখায় অনেক দূর এগিয়ে যাবে; যা তার জন্য যারপরনাই ক্ষতির কারণ হবে।

৮. ছুটির আমল আখলাক সম্পর্কে অবহিত করণ : ছুটিশেষে অভিভাবক সন্তানকে মাদরাসায় পৌঁছে দিয়ে অবশ্যই আসাতিযায়ে কেরামকে ছুটিতে সন্তানের পড়ালেখা ও আমলের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত করবেন। কেননা মাদরাসার ছুটি অবস্থায় তালিবে ইলম পুরো সময় আসাতিযায়ে কেরামের দৃষ্টির

আড়ালে থাকে। ফলে এসময়ে তার উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে আসাতিযায়ে কেরাম অনবগত থাকেন। কাজেই সন্তানের ছুটিকালীন আমল আখলাকের অগ্রগতি সম্পর্কে জানালে আসাতিযায়ে কেরাম উক্ত আমল বা আখলাক ধরে রাখার প্রয়াস পাবেন। তেমনিভাবে আল্লাহ না করুন কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে তা সংশোধনের চেষ্টাও করতে পারবেন।

অপ্রয়োজনীয় মোবাইল ব্যবহার

মাদরাসার ছুটিতে তালিবে ইলম বাড়িতে যাওয়ার পর তার মোবাইল ব্যবহারে আসাতিযায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হন। একজন তালিবে ইলমের মনোযোগ ও পাঠ্যাভ্যাস নষ্ট করার জন্য অল্প কয়েকদিন তার কাছে মোবাইল থাকাটাই যথেষ্ট। মালিকানাগ্রহণ ছাড়া কিছুদিনের শুধুমাত্র ব্যবহারেই এতোটা ক্ষতি হয় যে, এরপর অন্তত একমাস পর্যন্ত পড়ালেখায় প্রকৃত মনোযোগ বসানো কঠিন হয়ে যায়। এজন্য সন্তান ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পর তার মোবাইল ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ করা চাই। তা না করে উল্টো তাকে শিক্ষাজীবন চলা অবস্থায়ই মোবাইলের মালিক বানিয়ে দেয়া নিজ হাতে তার জীবন ধ্বংস করার নামান্তর। কাজেই এ ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকা জরুরী।

চার. প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জন শেষে

ইতোপূর্বে মাদরাসা খোলা অবস্থায় এবং মাদরাসার ছুটিতে অভিভাবকের যে দায়িত্বগুলো পালনের কথা আলোচনা করা হয়েছে এগুলোর অধিকাংশই সন্তানের বয়স বাড়ার সাথে পরিবর্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ, ছোট অবস্থায় সন্তান থেকে প্রতি সপ্তাহে পড়ালেখা ও আমল আখলাকের খোঁজখবর নিবেন, প্রতিমাসে আসাতিযায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করবেন; কিন্তু সন্তান কিছুটা বড় হলে প্রতি সপ্তাহের পরিবর্তে প্রতিমাসে এবং প্রতিমাসের পরিবর্তে প্রতি তিনমাস অন্তর অন্তর খোঁজখবর নেয়া ও আসাতিযায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করাই যথেষ্ট। এমনিভাবে সন্তানের বয়স বাড়ার সাথে সাথে অভিভাবকের আচরণে পরিবর্তন আসতে থাকবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত অভিভাবকের দায়িত্বপালন সীমিত হয়ে যাবে।

যেহেতু বয়োবৃদ্ধির ফলে সন্তান বুদ্ধিবৃত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বনির্ভরতা অর্জন করে তাই শিক্ষাসমাপনের আগে ও পরে অভিভাবক ও আসাতিযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন ধীরেধীরে কমে যায়। এ সময়ে মূলত সে আসাতিযায়ে কেরামের নির্দেশনায় কোনো দূরদর্শী আল্লাহওয়ালা বুযুর্গকে মুরব্বী বানিয়ে নিজেকে তাঁর তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করবে। এসময় অভিভাবক সন্তানের উন্নতি কিংবা সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বেশি দু'আ করবেন। বিশেষত অভিভাবকের আমলী দাওয়াত এ সময়ে অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হয়। অভিভাবকের আমলী উন্নতি দেখে দেখে তার যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমসন্তানও নিজের আমলের প্রতি যত্নশীল হতে অনুপ্রাণিত হয়। তা সত্ত্বেও কখনো কথার মাধ্যমে বা তার আসাতিযায়ে কেরামকে অবহিত করে সতর্ক করার নিতান্ত প্রয়োজন হলে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন। কারণ, এ ব্যাপারে সামান্য বাড়াবাড়ির কারণেও কখনো হিতে বিপরীত হতে দেখা যায়।

অভিভাবক যেন ছোট না হন

সন্তান শিক্ষাদীক্ষায় যতই অগ্রগামী ও যোগ্যতার অধিকারী হোক, অভিভাবক তার কাছে আজীবনই অনুসরণীয় ও মাননীয় হয়ে থাকবেন। এটা কখনোই উল্টে যাবার নয়। কোনো সন্তানের ইলমেদীনের মর্যাদা তার পিতার পিতৃত্বকে খাটো করার জন্য নয়; বরং আরো উর্ধ্বে তোলার জন্য। কাজেই প্রত্যেক আলেমসন্তানের পিতামাতার উচিত, ইলমের দিক দিয়ে সম্ভব না হলেও অন্তত তাঁরা আমলে ও আখলাকে যেন নিজেদের সন্তানের চেয়ে এগিয়ে থাকেন। তাঁদের কোনো ত্রুটি যেন সন্তানের চোখে ধরা না পড়ে। বরং তাঁদের আমল ও আখলাক দেখে যেন সন্তান স্বীয় অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয় এবং নিজের ত্রুটির জন্য লজ্জিত হয়। এতে সমাজের কাছে তো বটেই, আল্লাহ তা'আলার কাছেও উক্ত অভিভাবক আলেম সন্তানের আদর্শ পিতা হিসেবে যথার্থ ও পরিপূর্ণ সম্মান পাবেন। এর জন্য প্রত্যেক পিতা সন্তানের শৈশব থেকেই চেষ্টা করবেন, যেন যোগ্য পিতা হিসেবে ত্রুটিহীন অভিভাবকত্বের মাধ্যমে সন্তানকে বড় করা যায়।

সন্তানের ইলম প্রথমত আপনার জন্য

সন্তানকে মাদরাসায় পাঠানোর আগে অভিভাবক বা তার পরিবার তাদের নানাবিধ দীনী প্রয়োজন ও সমস্যাদির সমাধান জানার জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো বিজ্ঞ আলেমে দীনের শরণাপন্ন হবেন। তেমনিভাবে মাদরাসায় তার শিক্ষাজীবন চলা অবস্থায়ও এই ধারা বজায় থাকবে। অবশ্য তার শিক্ষাকালে এ জাতীয় বিষয়ে তার কাছ থেকেও সমাধান নেয়ার চেষ্টা করবেন। বরং আগেও বলা হয়েছে, সন্তান ছাত্রাবস্থায়ই তার ইলম ও শিক্ষা অনুযায়ী পরিবারে বা সমাজে কোনো সমস্যা বা ভুল দেখলে নিজে থেকেই যেন তার সমাধান বা সংশোধন করে দেয়, সে অভ্যাস অভিভাবক করাবেন। আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপন করত সন্তান পরিপূর্ণ আলেমে দীন হয়ে ঘরে ফিরে এলে এটা অভিভাবক ও সন্তান- উভয়েরই বড় প্রাপ্তি। এ সময় অবশ্যই তার ইলমের মূল্যায়ন করবেন। এ সময় থেকে পরিবারের ধর্মীয় বিষয়াদির সমাধান আগে তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবেন। এতে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে এবং ইলমের হক আদায়ে তার মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে এ জাতীয় ছোট বা বড় সমস্যার সমাধানে আলেম সন্তানকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করলে, কিংবা সন্তান স্বেচ্ছায় অভিভাবক বা পরিবারের সংশোধনে প্রয়াসী হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাধা দিলে বা নিরুৎসাহিত করলে এতে সে মানসিকভাবে মারাত্মক বিপর্যস্ত ও হতাশ হয়ে যায়।

এছাড়া সন্তানের ইলম থেকে নিজেরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি তার জন্য সমাজে এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও তার অর্জিত ইলম পৌঁছানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়া চাই। এর জন্য অভিভাবক তার পরিচিত পরিবেশে ও প্রতিবেশে নিজ সন্তানকে 'আলেম হিসেবে' পরিচিত করে তাদেরকে সন্তানের কাছ থেকে দীনী বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও সমস্যার সমাধান নেয়ার পরামর্শ দিবেন। এমনকি আত্মীয় স্বজন বা সমাজে কোনো ভুল বা অন্যায় সংশোধনের প্রয়োজন হলে সে কাজে তাকে উদ্যোগী করে নিজে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানকে পরিবার ও সমাজে যেভাবে মূল্যায়ন ও উপস্থাপন করা হয় ইলমে দীনের ধারক বাহক সন্তানকে কোথাও সেভাবে সম্মান ও সহযোগিতা করা হয় না। এটা আমাদের দুনিয়ামুখিতা ও দীন-বিমুখতা ছাড়া কিছুই নয়।

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিশুর অন্তর একটি উৎকৃষ্ট মুক্তা

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

শিশুকাল মানব জীবনের উর্বরতম অংশ, গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় অভিভাবক শিশুর বুকের কোমল যমীনে সত্য ও সুন্দরের বীজ বুনতে পারেন। পারেন সুস্থ চিন্তা, উত্তম চরিত্র ও উন্নত নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে। কেননা শিশুর ক্ষেত্রে সম্ভাবনা অসীম, সুযোগ সীমাহীন। তার আছে একটি নরোম, কোমল ও প্রশান্ত হৃদয়। আছে নির্মল স্বভাব, নির্দোষ সারল্য ও পরম পবিত্রতা। এ সময় যদি সে মানবিক সৌন্দর্যের ছোঁয়া পায় পূর্ণ মাত্রায়, তাহলে তার ভবিষ্যৎ বড়ই আশা জাগানিয়া। কতক জ্ঞানীর কথায় তা দীপ্যমান। তারা বলেন, শিশু তার পিতা-মাতার কাছে আমানত। তার পবিত্র অন্তর হল কারুকার্যহীন ধাতু বা পদার্থ, যাতে এখনো আকার আকৃতির ছোঁয়া লাগেনি। যে কোন রেখাচিত্র তাতে ফেলা যায়। যদি তাকে কল্যাণকর বিষয়ে অভ্যস্ত করা হয় ও ভালো কিছু শেখানো হয় তবে সে এর উপর গড়ে উঠবে এবং তার পিতা-মাতা ও শিক্ষক দুনিয়া আখেরাতে ভাগ্যবান হবেন। আর যদি তাকে মন্দত্বে অভ্যস্ত করা হয় এবং জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভ্রুক্ষেপহীন ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে দুর্ভাগা ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এর দায়ভার অভিভাবক ও পর্যবেক্ষকের উপরও বর্তাবে। শিশুর তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা কখনোই অনর্থক কাজ নয়। এটা তাকে পূর্ণতার দীক্ষা দেয়াও নয়। বরং পূর্ণতা প্রাপ্তির ভিত গড়া ও পিতা-মাতার অবশ্যস্বীকার্য দায়িত্ব পালন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা তাহরীম, আয়াত- ৬)

হযরত আলী রাযি. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তাদের শিষ্টাচার ও জ্ঞান শিক্ষা দাও। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শিশুর শিক্ষা-দীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা তাকে মূলত জান্নাতমুখী করা আর এ ব্যাপারে অবহেলা করা তাকে যেন জাহান্নামের পথ ধরানো। অতএব এ ব্যাপারে ঢিলেমির অবকাশ নেই।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তোমরা শিক্ষা দাও, সহজ করো, কঠিন করো না, গোস্বা চাপলে চুপ থাকো, গোস্বা চাপলে চুপ থাকো, গোস্বা চাপলে চুপ থাকো। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৫৫৬)

তা'লীম-তরবিয়ত তথা শিক্ষা-দীক্ষা হল সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। তার উত্তম পরিচ্ছদ। এ কাজ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চেয়েও উত্তম। সুতরাং একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের এই সৌভাগ্য লাভে সচেষ্ট হওয়া এবং ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে নিরন্তর সাধনায় লেগে থাকা উচিত। যাতে আজকের শিশুরা রাসূলের দীক্ষা পাওয়া শিশুদের মত গড়ে ওঠে। তবে এ ব্যাপারে সফলতা লাভ তখনই সম্ভব যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয় এবং তাঁর পথ ও পন্থা অনুসরণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا.

অর্থ : যদি তোমরা তার অনুসরণ কর সঠিক দিশা পাবে।

নাস্তিকদের প্রকোপে, বুদ্ধিগত স্রোতধারায়, আরবীয় সভ্যতায় কিংবা ইউরোপীয় গবেষণাপত্রে এর সমাধান মিলবে না। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের উপর সন্তুষ্ট থাকতে চায় তার জন্য এ প্রবন্ধে নববী তরবিয়ত ও প্রজন্মের জন্য ইসলামী প্রস্তাবনার কিছু সামান্য অংশ তুলে ধরার প্রয়াস পাব। শিশুর জন্মপূর্ব কাল থেকে যৌবনের বেলাভূমি পর্যন্ত পুরো সময়ের আদর্শ নির্দেশনা এ আলোচনায় চলে আসবে।

ইমাম গাযালীর শিশু-দর্শন

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, শিশুদের প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠন অতি গুরুত্ববহ ও নেহায়েত জরুরী বিষয়। শিশুরা পিতা-মাতার কাছে একটি আমানত। শিশুর অন্তর উৎকৃষ্ট মুক্তাতুল্য। যদি তাকে কল্যাণকর কাজে অভ্যস্ত করা হয় এবং ভালো কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাহলে সে সেভাবে গড়ে উঠবে। দুনিয়া আখেরাতে সৌভাগ্যবান হবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকে অপশিক্ষায় অভ্যস্ত করা হয় এবং জন্তু-জানোয়ারের মত বল্গাহীন ছেড়ে দেয়া হয় তবে শিশু নিশ্চিতই দুর্ভাগা ও বরবাদ হয়ে যাবে। সন্তানকে ধ্বংস থেকে রক্ষার উপায় হচ্ছে তাকে শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা শিক্ষা দেয়া এবং মন্দের সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। শিশুদের মধ্যে যখন কিছু সদ্বিবেচনা জাগ্রত হয় তখন তার অধিক দেখাশোনা করা জরুরী। লজ্জা-শরমের বিকাশ দ্বারা সদ্বিবেচনার সূচনা হয়। ফলে শিশু কতক কাজকর্ম লজ্জাবশত ছেড়ে দেয়। এটা এ কারণে হয় যে, তখন তার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধিরূপী নূরের ঝলক এসে যায় এবং সে কতক বিষয়কে কতক বিষয়ের তুলনায় খারাপ মনে করে। ফলে কুকর্ম করতে লজ্জাবোধ করে। এটা আল্লাহর দান। এটা চরিত্রের উৎকর্ষতা ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতার একটি শুভবার্তা। এতে বোঝা যায়, বড় হয়ে সে পূর্ণ বুদ্ধিমান হবে। এমন লজ্জাশীল শিশুকে অযত্নে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং লজ্জার গুণ অর্জনে তাকে সাহায্য করা দরকার।

শিশুকে সঠিক চিন্তাসহ বেড়ে ওঠার সময় যদি বল্গাহীন ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে বদস্বভাব হয়ে ওঠে। মিথ্যা, হিংসা, চুরি, পরনিন্দা ও অবাধ্যতার চরিত্র তার মধ্যে স্থান করে নেয়। ফালতু কথন, রঙ্গ-তামাশা এবং অশ্লীল স্বভাবের হয়ে ওঠে। এসব দুশ্চরিত্র থেকে শিশু নিরাপদ থাকবে যদি তাকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শেখানো হয়।

এরপর শিশুকে মকতবে পাঠিয়ে কুরআন-হাদীস ও সৎকর্ম-পরায়ণদের গল্প শেখানো উচিত। যাতে তার মনে সৎকর্ম-পরায়ণদের প্রতি মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিশু কোন উত্তম কাজ করলে তাকে পুরস্কৃত করবে, অন্যদের সামনে তার প্রশংসা করবে; এতে সে পুলকিত হবে। এক দু'বার উল্টাপাল্টা কাজ করলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে, পর্দা উন্মোচন করবে না। প্রকাশ করে দিবে না। বিশেষ করে এমন কাজ যা শিশু নিজেই গোপন করে এবং যারপরনাই লুকাতে চেষ্টা করে। পুনরায় এ খারাপ কাজটি করলে তাকে গোপনে শাসাবে। একটু কঠিন স্বরে বলে দিবে, 'খবরদার! ভবিষ্যতে এমন হলে কিন্তু মানুষের সামনে অপদস্থ হতে হবে!'

শিশুকে সর্বদা শাসানো উচিত নয়। এতে সে তিরস্কারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং

মন্দকাজ করার সাহস বেড়ে যায়। কথার প্রভাব তার থেকে উঠে যায়। সুতরাং শিশুকে মাঝে মাঝে শাসাবে; সবসময় নয়। পিতার ন্যায় মাতাও শিশুকে মন্দকাজে বাধা দিবে এবং মাঝে-মধ্যে পিতার ভয় দেখাবে। তবে সব সময় নয়। কেননা, 'তোমার পিতা আসুক, তখন মজাটা বুঝবে' এমন কথা বারবার বলতে থাকলে তার অন্তরে মায়ের কোন মর্যাদা থাকবে না, মায়ের শাসনের সে তোয়াক্কা করবে না।

শিশুকে দিনের কিছু অংশে হাঁটাহাঁটি, দৌড়াদৌড়ি এবং খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে। যাতে তার মধ্যে আলস্য বাসা না বাঁধে। শিশুকে পিতার মালিকানার কোন কিছু নিয়ে সমবয়সীদের সাথে বড়াই করতে দেয়া যাবে না। বরং বিনয় স্বভাবে অভ্যস্ত করতে হবে। সঙ্গীদের সঙ্গে যাতে সম্মানের আচরণ করে এবং বিনম্র ভাষায় কথা বলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাকে শেখাতে হবে, গৌরব হল কাউকে কোন কিছু প্রদান করায়; দান গ্রহণে নয়। পক্ষান্তরে কারো থেকে কোন কিছু নেয়া নীচতা, অপদস্থতা ও হীনতা; যদিও গরীবের সন্তান হয়। শিশুকে শেখাবে, লোভ করা এবং হাত পাতা লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর। শিশু যাতে মজলিসে থুথু না ফেলে, শ্লেষ্মা না ঝাড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। অন্যের সামনে হাই তোলা, কাউকে পিঠ করে বসা, পায়ে পা তুলে বসা, থুতনীর নিচে হাত বা শরীর রেখে বসা, মাথা হেলান দিয়ে বসা– এসব অভ্যাস যাতে তার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। কারণ এসবই অলসতার আলামত। শিশুকে বসার আদব শিখিয়ে দিবে। অধিক বচন থেকে নিষেধ করবে। কারণ এটা নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতার প্রমাণ। সত্য-মিথ্যা যে কোন কথার সাথে কসম খেতে বাধা দিবে। যাতে শিশুকাল থেকে এতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে। শিশুকে আগেভাগে কথা বলা থেকে বিরত রাখতে হবে। তাকে জবাবের অতিরিক্ত কথা না বলার অভ্যাস গড়তে হবে। বড় কেউ কথা বললে সে যাতে মনোযোগের সাথে শোনে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বয়সে তার চেয়ে বড়দের উপরে যেন না দাঁড়ায় বা না বসে, বড়দের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় এসব বিষয়ে অভ্যস্ত করতে হবে। অর্থহীন ও অশ্লীল কথা, অভিসম্পাত ও গালিগালাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। এমনকি শিশুকে এমন বদস্বভাব লোকের সংস্পর্শ থেকেও দূরে রাখতে হবে। কেননা মন্দ সঙ্গীর এসব ভাইরাস অন্যের মধ্যে সংক্রমিত হয়। মূলত মন্দসঙ্গ থেকে দূরে রাখা শিশুর সচ্চরিত্রের প্রকৃত দীক্ষা। শিশুকে পিতা-মাতা, শিক্ষক, পরিচিত, অপরিচিত সমস্ত বড়দের আনুগত্যের শিক্ষা দিবে।

শিশু সদ্বিবেচনার বয়সে পৌঁছলে তাকে উযূ ও নামায শিক্ষা দিবে। রমাযান মাসে কিছু কিছু রোযা রাখাবে।

এমন সব মৌলিক বিষয় শিখানোর ব্যাপারে শিশুর খুব যত্ন নিতে হবে। কেননা শিশু হল এমন পাত্র যাতে ভালো মন্দ উভয়টি ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। শিশুর পিতা-মাতা তাকে যেদিকে ইচ্ছা ধাবিত করতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أوينصراه أويمجسانه.

অর্থ : প্রতিটি শিশুই স্বভাবধর্ম (ইসলাম) -এর ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায় কিংবা খ্রিস্টান বানায়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৮৫)

রাসূলের ভাবনায় শিশুর জীবন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের অধিক ভালোবাসতেন। এ কারণে তার শিশু বিষয়ক ভাবনা বিস্তৃত ছিল পরবর্তী প্রজন্মের উঠানেও। তায়েফবাসীরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং পাথর নিক্ষেপ করে তার দেহ মুবারক রক্তাক্ত করল তখন পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ আবেদন করলেন, বেয়াদব তায়েফবাসীকে আমরা দুই পাহাড়ের মাঝে পিষে দিই। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান থেকে চিরভাস্বর সেই শব্দ বেরিয়ে এলো,

أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.

অর্থ : আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এমন প্রজন্ম তৈরি করবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩২৩১)

শিশুর পৃথিবীতে আগমন যেন হয় নির্বিঘ্ন ও সহজ

পৃথিবীতে আগমন কালে যাতে মা ও শিশু উভয়ে নিরাপদ থাকে এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল শিখিয়ে দিয়েছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. 'আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব মিনাল কালিমিত তায়্যিব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হযরত ফাতেমা রাযি. এর যখন সন্তান প্রসবের সময় হল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইম রাযি. ও যাইনাব বিনতে জাহাশ রাযি. কে হযরত ফাতেমার কাছে এই বলে পাঠালেন, তারা যেন তার কাছে আয়াতুল কুরসী ও এই আয়াতগুলো পাঠ করে,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

এবং শেষে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে। (আল-আযকার লিন-নববী; হা.নং ৮৩৬)

عمل اليوم والليلة لابن السنى– ٦٢٠ اسناده ضعيف.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আসমা বিনতে উমাইসকে বিপদ ও কষ্টের সময় এ দু'আ পড়তে শিখিয়েছেন– الله الله ربى لا اشرك به شيئا. (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৫২৫)

তরবিয়ত হবে সূচনা থেকে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় শিশুর কোমল অন্তরে প্রথম রেখাচিত্র হবে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের এবং তার কানে বাজবে শাহাদাতের অমীয় বাণী। হযরত আবূ রাফে' তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন হযরত হাসান রাযি. জন্মগ্রহণ করেন তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কানে আযান দিতে দেখেছি। উক্ত হাদীসের আরবী পাঠ এই,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلاة. (سنن الترمذى– ١٥١٤)

ইমাম বাইহাকী রহ. বর্ণনা করেন,

أذن فى أذنه اليمنى واقام فى أذنه اليسرى.
قال البيهقى: اسناده ضعيف.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান রাযি. এর ডান কানে আযান দিলেন এবং বাম কানে ইকামত দিলেন। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৮৬২০)

শিশুর মুখে প্রথম বাক্য হবে তাওহীদের স্বীকৃতি

আধুনিকতার নামে বিজাতীয় পদ্ধতিতে শিশুর মুখের বুলি ফোটানো মূলত শিশুর

প্রাপ্য অধিকার খর্ব করা। 'বাই বাই', 'টা-টা' এসব শিশুর জীবনের প্রথম বাক্য হতে পারে না। যে পরিচ্ছন্ন ফিতরাত ও স্বভাব নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তাকে সে ফিতরাতের উপযোগী বাক্য শিখানো উচিত। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা তোমাদের শিশুদের প্রথম কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিখাও। হাদীসের আরবী পাঠ এই–

افتحوا على صبيانكم اول كلمة "لا اله الا الله".

اخرجه البيهقى فى شعب الايمان من طريقين تكلم فيهما.

সুন্দর নাম শিশুর অধিকার

নাম নির্বাচনে মানুষের মধ্যে অদ্ভুত রুচি-পছন্দ লক্ষ্য করা যায়। কিছু অভিভাবক এমন নাম নির্বাচন করেন যে, নাম শুনে বুঝা যায় না, শিশুটি মুসলিম না অমুসলিম! হিন্দুদের প্রভাবে অনেককে হিন্দুয়ানী নাম নির্বাচন করতে দেখা যায়। কেউ কেউ ইংরেজদের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে সন্তানের নামও রাখে অনুরূপ সামঞ্জস্যশীল।

এ তো হল কথিত প্রগতিশীলদের রুচিবোধ। যদি ইসলামপ্রিয় মুসলমানের কথা বলি, নাম সংস্কৃতিতে তাদের চিন্তা-চেতনাও রীতিমত ভাবিয়ে তোলে। কুরআন থেকেই তারা নাম রাখে; কিন্তু নামের নমুনা হল 'রাদ' (বজ্র), 'মাহীন' (তুচ্ছ, হীন) 'ইন্নামিন' (নিশ্চয় থেকে)। এরকম খারাপ অর্থবোধক বা অর্থহীন নাম শিশুর জীবনে তো খারাবিই বয়ে আনবে। নামের প্রভাব নামধারীর উপর পড়ে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা ঘটনা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী? বললাম, 'হায্ন' (অসমতল শক্ত ভূমি, দুঃখ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার নাম এখন থেকে 'সাহল' (সহজতা, নরম ভূমি)। তিনি বললেন, আমি আমার পিতার রাখা নাম পরিবর্তন করতে চাচ্ছি না। দাদার এ ঘটনা উল্লেখের পর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন,

فما زالت تلك الحزونة فينا بعد.

অর্থ : নাম পরিবর্তন না করায় দুঃখ-দুর্দশা আমাদের পরিবারকে সবসময় ভুগিয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬১৯)

হাদীসের পাতাগুলো উল্টালে দেখা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক মন্দ নাম পরিবর্তন করেছেন– 'আসিয়া' (অবাধ্য, পাপী) কে 'জামীলা' (কাজেকর্মে সুন্দর) দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। 'আসরাম' নাম পরিবর্তন করে 'যারআ' রেখেছেন। এমনও ঘটেছে যে, বাহ্যিকভাবে ভালো মনে হয়, তথাপি কারণবশত রাসূল সেই নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যেমন 'শিহাব' নামটি পরিবর্তন করে 'হিশাম', 'বাররা' পরিবর্তন করে 'যাইনাব' রেখেছেন। এজন্য নাম রাখার সময় বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নেয়া আবশ্যক।

শিশুর প্রথম খাদ্য

শিশুর পেটে প্রথম যে খাদ্য প্রবেশ করবে তা যাতে শিশুর সত্তায় পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার আবহ সৃষ্টি করে– ইসলামী সংস্কৃতিতে তারও বিবেচনা করা হয়েছে। তাই কোন নেককার, পবিত্র ব্যক্তির চিবানো খাদ্য শিশুর মুখে তুলে দেয়ার বিধান রয়েছে। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, উম্মে সুলাইম রাযি. যখন সন্তান প্রসব করলেন, তিনি আনাসকে দিয়ে নবজাতককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর চিবিয়ে মুখে থুথু জমা করলেন। অতঃপর নবজাতকের মুখে তা দিয়ে দিলেন। শিশুটি তখন ঠোঁট চাটতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসিকতা করে বললেন, حب الانصار التمر (আনসারদের কাছে খেজুর খুব প্রিয় খাদ্য!)। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১৪৪)

'ছেলে না মেয়ে?' একটি অযৌক্তিক প্রশ্ন

নব্য জাহেলিয়্যাতের ছড়াছড়ির কারণে এখন কারো সন্তান হলে মানুষের উৎসুক জিজ্ঞাসা থাকে, 'ছেলে হয়েছে, না মেয়ে?' 'ছেলে' হওয়ার সংবাদ পেলে মনে করে লোকটার কপাল বটে! অপরদিকে 'কন্যা' হয়েছে শুনলে মনে করে হায়রে! বেচারার কপাল! অথচ ইসলামের শিক্ষায় কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তান উভয়ের পিতা-মাতা যথাস্থানে মর্যাদাশীল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কন্যা সন্তানের পিতা-মাতার জন্য পরকালের সাফল্য লাভ করা অনেক সহজ মনে হয়। তাই এমন প্রশ্ন করা অনর্থক এবং ছেলে সন্তান হয়েছে শুনলে অধিক আনন্দিত হওয়ারও কিছু নেই। এভাবে প্রশ্ন করা উচিত– 'সন্তান শারীরিকভাবে সুস্থ কি না?', 'পরিপূর্ণ গঠন নিয়ে দুনিয়াতে এসেছে কি না?' ইত্যাদি। হযরত আয়েশা রাযি. আত্মীয় বা পরিচিতদের কারো সন্তান হলে পুত্র-কন্যা নিয়ে প্রশ্ন করতেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, خلق سويا؟ সুস্থ, স্বাভাবিক গঠনে জন্মেছে? উত্তরদাতা যদি বলত হ্যাঁ, তিনি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলতেন। (আল-আদাবুল মুফরাদ; হা.নং ১২৫৬)

আচার অনুষ্ঠান ইসলামী বানানো কাম্য

রাসূলের শিক্ষায় শিশুকে তার স্বভাব-ফিতরাতে গড়ে তোলার নির্দেশ রয়েছে। তাই শিশুর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় এমনকি আকীকা অনুষ্ঠানও বিজাতীয় সংস্কৃতিমুক্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে বিশেষ পদ্ধতিতে নবজাতকের আকীকা করা হত। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ দারদা রাযি. বলেন, জাহেলী যুগে আমাদের কারো সন্তান হলে বকরী যবেহ করে সেই যবেহকৃত পশুর রক্ত শিশুর মাথায় মেখে দেয়া হত। ইসলামের আগমন ঘটার পর আমরা বকরী যবেহ করতাম এবং নবজাতকের মাথা মুণ্ডিয়ে তাতে জাফরান মেখে দিতাম। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৮৪৩)

শিশুর মাথা মুণ্ডনে ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। অমুসলিমদের আবিষ্কৃত ছোট বড় নানা ডিজাইনে চুল ছাঁটা বা কাটা অত্যন্ত দোষণীয় কাজ। হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হযরত ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعض.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায্ থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাফে'কে জিজ্ঞাসা করলাম, কায্ কী? তিনি বললেন, শিশুর মাথার কিছু চুল কাটা আর কিছু রেখে দেয়া। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১২০)

অথচ আজকাল তথাকথিত প্রগতিশীলরা সন্তানের চুলে মেসি, নেইমার, রোনালদো কাটিং দিয়ে নিজেকে সভ্য ভাবতে ভালোবাসে। একসময় যা ছিল চোরা কাটিং; সময়ের পালাবদলে তা-ই এখন ভব্যতার প্রতীক!

ছোট থেকে শিশুকে ইসলামী ধাঁচের কাপড়-চোপড় পরাতে হবে। কারণ তার পরিচ্ছন্ন অন্তর যেভাবে গড়ে তোলা হবে সেভাবে গড়ে উঠবে। এ কারণে

ছোটদেরকেও পোশাকের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস তখন ছোট ছিলেন। একদিন তিনি হলদে কুসুমী রঙের একজোড়া পোশাক পরিধান করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন,

إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.

অর্থ : খোকা! এ তো অমুসলিমদের পোশাক! এ সব পরো না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০৭৭)

খুবই আফসোস হয়, যখন দেখি দীনদার, সাধারণ নির্বিশেষে সকলের রুচিই পশ্চিমা পোশাক সংস্কৃতির প্রভাবে বিকৃত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শিশুদের খেলার সাথী

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ঊর্ধ্বজগতে যেমন শ্রেষ্ঠ, এই পৃথিবীর বুকেও তার তুলনা নেই। তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার রাসূল ছিলেন। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও শিশুদেরকে কাছে পেলে তাদের বন্ধু হয়ে যেতেন। শিশুরা তাকে অত্যধিক ভালোবাসত। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনার বাইরে দীর্ঘ সফর শেষে ফিরে আসতেন শিশুরাও তার অভ্যর্থনায় মদীনার বাইরে পর্যন্ত চলে যেত। যেন এতদিন তারা তার প্রতীক্ষায় অধীর ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শিশুদেরকে দেখতে পেতেন কাউকে বাহনের পেছনে, কাউকে সামনে উঠিয়ে মদীনায় প্রবেশ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাযি. এক হাদীসে বর্ণনা করেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته قال وإنه قدم من سفر فسبق بى إليه فحملنى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه...

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে আসলে পরিবারস্থ শিশুদের মাধ্যমে তার অভ্যর্থনা হত। একবার তিনি সফর থেকে আসলেন। (ছোটদের মধ্যে) তাঁর সামনে আমাকে প্রথম উপস্থিত করা হল। তিনি আমাকে বাহনের সামনে তুলে নিলেন। অতঃপর ফাতেমা রাযি. এর এক সন্তানকে আনা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পিছনে তুলে নিলেন। এভাবে আমরা তিনজন একসঙ্গে একই বাহনে মদীনায় প্রবেশ করলাম। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৪২৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে কোথাও গেলে ফিরে এসে শিশুদেরকে ডেকে আনতেন। ডাকার শব্দ ও ধরণ হত খুবই আদরের। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী কাইনুকা'র বাজারে গেলেন। ফিরে এসে ডাকতে লাগলেন, পুচকেটা কোথায়! হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন,

فجاء الحسن عليه السلام فاشتد حتى وثب في حبوته.

অর্থ : (আদুরে ডাক শুনে) শিশু হাসান সবেগে ছুটে আসলেন এবং রাসূলের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।... (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১০৮৯১)

শিশুদের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহ্বা ও মুখ দিয়েও খেলা করতেন। এতে শিশুরা খুব আনন্দ পেত এবং তাঁর কাছে ছুটে আসত। হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه.

قال الالبانى: هذا اسناد حسن.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু হাসান ইবনে আলী রাযি. এর সাথে জিহ্বা বের করে (খেলতেন)। শিশু হাসান জিহ্বার লালিমা দেখে আনন্দাতিশয্যে রাসূলের কাছে ছুটে আসত। (আখলাকুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিআবিশ শাইখ; পৃষ্ঠা ১৭৮)

শিশুদের সঙ্গে রাসূলের এমন দুর্লভ আচরণও পাওয়া যায় যা পাঠক শুনে হয়ত অবাক হবেন। কারণ প্রচণ্ড ভালোবাসা ও নিবিড় সম্পর্ক না থাকলে এ ধরনের আচরণ কল্পনাও করা যায় না। প্রকৃত সত্য হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুর কোমল হৃদয়ের উপযোগী আচরণ উম্মতকে শেখাতে চেয়েছেন। লক্ষ্য করুন, হযরত জাবের রাযি. একদিন রাসূলের ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখেন, রাসূল চার হাতপায়ে ভর করে চলছেন আর শিশু হাসান ও হুসাইন রাযি. তাঁর পিঠে সওয়ার। (রসিকতা করে) তিনি বলছেন,

نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما.

قال الذهبي: مسروح لين.

অর্থ : তোমাদের বাহন কতই না উত্তম বাহন! আর (বাহনের পিঠে) তোমরা কতই না উত্তম বোঝা। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৪৩৩)

শিশুদের প্রতি ভালোবাসার কিছু নমুনা

শিশুরা নামাযের সময় মায়েদের কোলে উঠতে ভালোবাসে। এতে কোন কোন জননী বিরক্ত হন। অনেক সময় একথাও বলে ফেলেন, 'নামাযটাও শান্তিতে পড়তে দেয় না'। আসলে শিশুদের হৃদয় এতো কোমল যে, তাদের প্রসঙ্গে সামান্য রুক্ষতাও ইসলাম পছন্দ করে না। বরং সর্বাবস্থায় আদর-সোহাগ পাওয়া তাদের অধিকার। হযরত আবূ কাতাদা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল স্বীয় পৌত্রী উমামা রাযি. কে বহন করে নামায পড়েছেন। যখন সিজদা করতেন নিচে নামিয়ে রাখতেন আর যখন দাঁড়াতেন কোলে উঠিয়ে নিতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৪)

শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন,

وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه.

অর্থ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতেন, নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন এই আশঙ্কায় যে, না জানি তার মা আপদে পড়ে যায়! (অর্থাৎ নামাযও ছাড়তে পারছে না, সন্তানের কী হল তা-ও বুঝতে পারছে না)। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭০৮)

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। দেখলেন, হাসান ও হুসাইন লাল কাপড় পরে হেঁটে আসছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে তাদের কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন, এ অবস্থা দেখে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। তাই কথা বন্ধ করে ওদেরকে উঠিয়ে নিলাম। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৭৭৪)

শিশুদের কোলে তোলা, আদর করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। তারা পেশাব করে দিলে করতে দেয়া। আমরা অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে শিশুর পেশাব চলাকালীন কোল থেকে নামিয়ে দিতে চাই– এটা রাসূলের আদর্শের বিপরীত। হযরত উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান বলেন, আমি আমার শিশু সন্তানকে নিয়ে রাসূলের কাছে গেলাম। তার তখনও স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ শুরু হয়নি। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে পেশাব করে দিল। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনালেন

এবং পানি ছিটিয়ে ধৌত করে নিলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৬৯২)

উল্লেখ্য, ইমাম নববী রহ. বলেন,

واعلم أن هذا الخلاف انما هو في كيفية تطهير الشئ الذى بال عليه الصبى ولا خلاف في نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا اجماع العلماء على نجاسة بول الصبى.

অর্থ : শিশুর পেশাব কাপড়ে লেগে গেলে তা কিভাবে পবিত্র করা হবে, সে ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কিন্তু তার পেশাব নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। (শরহুন নববী আলা মুসলিম)

শিশুর লালন-পালন পিতা-মাতার করা উচিত

শিশুর কোমল হৃদয়ের যথাযথ পরিচর্যার জন্য তার লালন-পালনের মূল দায়িত্ব মায়ের পালন করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা সন্তানের জন্য মায়ের অন্তরে যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তার বিকল্প নেই। শুধু মানুষ নয়, পশু-পাখির ক্ষেত্রেও এ সত্য চির ভাস্বর। জলে-স্থলে সব প্রাণী নিজেই তার সন্তানের লালন-পালনকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্য পশ্চিমা সমাজের; তারা পালিত কুকুরের অধিকার আদায়ে অত্যধিক সচেতন হলেও সন্তানের ক্ষেত্রে 'বেবি কেয়ার হাউজ' তাদের প্রথম পছন্দ। তাদের এ পরিত্যাজ্য সংস্কৃতি এখন মুসলিম সমাজেও বাঁধভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় প্রবেশ করছে। ফলে ইসলামী শিক্ষায় মায়ের কোল যে শিশুর প্রথম বিদ্যাপীঠ ঘোষণা করা হয়েছে তা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিশুর লালন-পালনকারী হচ্ছে কাজের বুয়া। মায়েরা অফিস নিয়ে ব্যস্ত। নারীদের এভাবে ঘর থেকে বের করায় হয়তো বা অর্থনৈতিকভাবে কিছু উন্নতি ঘটেছে(!) কিন্তু সন্তান সুসভ্য, চরিত্রবান, সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠার বারোটা বেজেছে। বর্তমান সমাজে ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানরা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠার মূল কারণ এটাই যে, শিশুকালে সুন্দর পরিবেশ পেয়েছে ঠিক; কিন্তু সঠিক পরিচর্যা পায়নি। মায়ের কোল হয়নি তার আদর্শ বিদ্যাপীঠ। বুয়ারা ছিল তাদের প্রধান শিক্ষক। শিশুর সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য যেমনিভাবে আদর্শ পরিবেশের প্রয়োজন তেমনি সঠিক পরিচর্যাও একান্ত জরুরী।

সন্তানের পক্ষ থেকে মায়ের সদাচরণ লাভের অধিকার দু'টি কারণে- এক. গর্ভধারণ ও দুই. শিশুর লালন-পালন। কুরআনে যেখানে সন্তানকে মায়ের সাথে সদাচরণ করার হুকুম করা হয়েছে সেখানে কারণ হিসেবে উল্লিখিত দু'টি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো হল বড় দু'টি কারণ। সুতরাং মা-বাবার জন্য কুরআনে বর্ণিত ফযীলত লাভের জন্য লালন-পালন বিষয়ক কুরআনী নীতি গ্রহণ করতে হবে।

লেখক : মুদাররিস, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ মাদরাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। খতীব, বাইতুর রহমান জামে মসজিদ, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা।

বিসমিহী তা'আলা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষাসমাপনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত

'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র

বার্ষিক ফুযালা সম্মেলন ২০১৭

স্থান : জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া

৮ এপ্রিল ২০১৭ শনিবার সকাল ৯টা হতে আসর পর্যন্ত

সম্মেলনে রাবেতার সকল সদস্যকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো যাচ্ছে

কেন্দ্রের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও রাবেতার কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না-ও হতে পারে, এজন্য ফুযালায়ে কেরামকে পার্শ্ববর্তী/পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগের অনুরোধ করা যাচ্ছে। দূরবর্তী ফুযালায়ে কেরামকে সম্মেলনের আগের দিন চলে আসার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জামি'আর পক্ষে

মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

মাওলানা হিফজুর রহমান
প্রিন্সিপ্যাল
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

রাবেতার পক্ষে

মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল মাসউদ
আমীর, মজলিসে শূরা
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া

হজ্জের সফরনামা

হিজাযের মুসাফির

মুফতী সাঈদ আহমাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুনিয়া দারুল ইমতিহান (পরীক্ষাগার)। ঈমানদারের প্রতি কদমেই পরীক্ষা। আল্লাহর মর্জিকেই অগ্রাধিকার দিবে, না নফস ও শয়তানের মর্জিকে? জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুমিনের বিবেকের সামনে প্রশ্নটি উত্থাপিত থাকে। ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, লেন-দেন, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনার সকল পর্বেই থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির একটা পথ। আরেকটা থাকে নফস ও শয়তানের পথ। অতি পবিত্র স্থানে কিংবা সর্বাধিক পুণ্যময় সময় ও কাজের ক্ষেত্রেও নফস ও শয়তান ধোঁকার পথ ও পন্থা নিয়ে হাযির থাকে মুমিন বান্দাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যে। শরীয়তের পরিভাষায় এমন পরিস্থিতিকে বলা হয় ফিতনা। এ ফিতনার আকার-আকৃতি, গতি ও প্রকৃতি মুমিন বান্দার করণীয় কাজের ধরণ অনুপাতে পরিবর্তনশীল। কাজটি যত স্পর্শকাতর ও লাভজনক হয় সে কাজে ফিতনার বিষয়টিও ততো সুক্ষ্ম ও ক্ষতিকর হয়। কপালপোড়া হতভাগারা নফস ও শয়তানের পাল্লায় পড়ে বে-হিসাব লাভের কাজেও শূন্য হাতে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফেরে। এ জাতীয় কাজের তালিকা অনেক দীর্ঘ। আমাদের এ পর্বের আলোচ্য বিষয় যেহেতু হিজায তথা পবিত্র মক্কা-মদীনার সফর কাজেই এ সফরের কিছু মারাত্মক ফিতনার কথাই আজ লিখতে চাই।

ক.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী,

المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان.

অর্থ : নারীজাতি গোপন থাকার যোগ্য। গোপনীয়তা ভেদ করে বাইরে গেলে শয়তান তাকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৭৩)

নবীজীর কথা শতভাগ সত্য। দয়ার নবীর কথায় নারীজাতির প্রতি কোন শত্রুতা নয়; বরং রয়েছে অফুরন্ত দয়া। এ দয়ার রহস্য বুঝে আসলে ভালো। আর বুঝে না আসলে নিজ বুঝের প্রতি ঝাড়ু মেরে নবীজীর কথাই মানতে হবে।

সুতরাং প্রয়োজনে কোথাও বের হতে হলেও গোপনীয়তা রক্ষা করেই বের হতে হবে। এর জন্য শরীয়ত নারীজাতিকে দান করেছে পর্দার বিধান। পর্দার মাধ্যমে তারা শয়তান ও শয়তান জাতীয় মানুষদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবে। বেপর্দা নারী নিজের ও অন্যদের জন্য এক বিরাট ফিতনা। এরা শয়তানের মিশন বাস্তবায়নে সফল ভূমিকা রাখে। এজন্যই শয়তান এদেরকে টার্গেট করে। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, অফিস-আদালত ও জেনারেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় সকল জায়গা শয়তান ও বেপর্দা নারীদের যুগপৎ উপস্থিতিতে আজ বিষাক্ত হয়ে আছে। পৃথিবীর বুকে প্রবিত্রতম স্থান মক্কা-মদীনায়ও এরা অতি নেক সূরতে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। হজ্জ ও উমরা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের চেহারা দেখানো কোনভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা মুমিন পুরুষদেরকে আদেশ করেছেন বেগানা নারীদের থেকে নিজেদের চক্ষুকে নিচু করে রাখতে। (সূরা নূর- ২৯)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেগানা নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি শয়তানের বিষমিশ্রিত তীর। (আল-মু'জামুল কাবীর; হা.নং ১০৩৬২) সুতরাং এ জাতীয় তীর থেকে তারা নিজেদেরকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় চেহারা কাপড় দ্বারা আবৃত করা যায় না এ অজুহাতে লাখ লাখ নারী পরপুরুষকে নিজের চেহারা দেখানোর লাইসেন্স নিয়ে নেয়। আর নফসপুজারী কিছু মূর্খ লোক তাদের এ কাজে উৎসাহ যোগায়। আমাদের দেশের যে সকল নারীরা নিজ দেশে পর্দা পুশিদার ধার ধারে না তারা এমনি নাচুনি বুড়ি সেখানে গিয়ে যখন পায় ঢোলে বাড়ি, তখন তাদের বে-পর্দেগীর দৌরাত্ম সীমা অতিক্রম করে যায়। দেশে ফিরে এরা মসজিদ দখলের অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়। যুক্তি হল, হারাম শরীফের জামাআতে যদি নারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ না হয়, তাহলে দেশে মহল্লার মসজিদে সমস্যা কোথায়! আমাদের দেশের আলেমরা কি মক্কা-মদীনার আলেমদের চেয়ে বেশি বোঝে? এদের কাছে কুরআন-সুন্নায় সামগ্রিক জ্ঞানে পারদর্শী মুজতাহিদ ইমাম তো দূরের কথা স্বয়ং নবীজীর সর্বাধিক প্রিয় সহধর্মিনী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নারী-আলেম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. এর উক্তি ও শ্রেষ্ঠ ফিকহবিদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. ও শয়তানের আতঙ্ক দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযি. এর আমলের কোন গুরুত্ব নেই। তেমনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, নারীদের জন্য ঘরে নামায পড়াই উত্তম বরং অনেকগুণ উত্তম। দেখুন সুনানে আবূ দাউদ (হা.নং ৫৭০)।

এ জাতীয় বাণী কেমন যেন প্রাথমিক সময়ে মসজিদে গমনের অনুমতি সংবলিত হাদীসসমূহ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (নাউযুবিল্লাহ)

কুরআন-সুন্নায় বিশেষজ্ঞ উলামা ও ইসলামের মূল ভাবধারায় অবগত মুমিন বান্দাদের মতে যে সকল নারীরা মক্কা-মদীনায় তথা হজ্জ ও উমরার সফরে গিয়ে শুধু পুরুষদের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য হোটেল বা বাসা ছেড়ে মসজিদে যায় তারা প্রতি রাকাআতে লক্ষ রাকাআত বা অর্ধলক্ষ রাকাআতের সওয়াব অর্জনের পরিবর্তে এক রাকাআতের সওয়াবও হাতছাড়া করার আশঙ্কায় উপনীত হয়। তাদের কারণে অসংখ্য পুরুষের হারাম শরীফে নামায আদায়ে কত কষ্ট হয়। অথচ পুরুষদের জন্য জামাআতে শরীক হওয়া শরীয়ত মতে ওয়াজিব। পক্ষান্তরে নারীদের জন্য মুস্তাহাবও নয়।

আর যদি হারাম শরীফে গমনকারিনী চেহারা প্রদর্শনকারিনী হয় তাহলে তো লাখ রাকাআতের সওয়াবের পরিবর্তে লাখ লাখ লোকের সামনে চেহারা মোবারক উন্মুক্ত করে দিয়ে লাখ লাখ গুনাহ কামাই করার সুযোগ পাবেন একথা জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ পুরুষদের জন্য বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম। এতদসত্ত্বেও যে নারী মুখ উন্মুক্ত করে দেখার সুযোগ করে দিবে তার কোন গুনাহ হবে না; বরং শুধু সওয়াব হবে? বিবেক ঠিক থাকলে এমনটা ভাবা সম্ভব নয়।

আর যে নারী চলাচলের পথে বা তাওয়াফরত অবস্থায় পুরুষের সাথে ধাক্কাধাক্কিতেও অভ্যস্ত হয় সে যে কী পরিমাণ সওয়াব বা গুনাহ অর্জন করতে পারে এটা অনুমান করার ভার পাঠকের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

বস্তুতঃ নারীদের জন্য পবিত্র মক্কা-মদীনাতেও মসজিদে নামায আদায়ের

তুলনায় গৃহে আদায় করা অধিক সওয়াবের কাজ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তাদের ঘর তাদের জন্য উত্তম।

অন্য বর্ণনায় স্বয়ং নবীজীর পিছনে নামায পড়ার চেয়েও কয়েকগুণে বেশি উত্তম। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৫৭০)

এর বিপরীতে দুর্বলতম কোন সনদেও একথা বর্ণিত নেই যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, নারীদের জন্য ঘরে নামায পড়ার তুলনায় মসজিদে নামায পড়া উত্তম। তাতে বোঝা যায় পুরুষগণ যদি হারাম শরীফে নামায পড়ে লক্ষগুণ সওয়াব পায় তাহলে নারীগণ হোটেলে বা বাসায় নিজ কামরায় নামায পড়ে তার চেয়েও বেশি সওয়াব পাবে। অনুরূপ মদীনাতেও। তাহলে তারা কিসের আশায় শুধু নামায পড়তে হারাম শরীফে গিয়ে নিজেরাও কষ্ট করবে, পুরুষদেরকেও কষ্ট দিবে এবং ফিতনায় ফেলবে! তাদের এমন অহেতুক তৎপরতায় আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন, নাকি শয়তান খুশি হবে? বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করলেও বুঝে আসার কথা।

তবে তাওয়াফ করতে গিয়ে নামাযের সময় হয়ে গেলে নারীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে গিয়ে হারাম শরীফে জামাআতে নামায পড়ার অবকাশ আছে। সেক্ষেত্রেও বাসায় নামাযের তুলনায় সওয়াব কম হবে। কাজেই জামাআতের সময়কে আগে পিছে রেখে তাওয়াফ করতে না গিয়ে সকালে নাস্তার পর আর রাতে খানার পর তাওয়াফ করতে গেলেই ভালো হয়।

আর চেহারার পর্দা সর্বাবস্থায় করতে হবে। ইহরাম কিংবা হালাল অবস্থা কোন ক্ষেত্রেই পরপুরুষকে চেহারা দেখানো হালাল হয় না। কুরআন-সুন্নাহ মতে নারীদের চেহারাও সতরের (পর্দার) অন্তর্ভুক্ত। তবে গুরুত্বের দিক থেকে সতরের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন পেট ও পিঠের তুলনায় লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার গুরুত্ব বেশি। তেমনি চেহারার তুলনায় পেট ও পিঠ ঢেকে রাখার গুরুত্ব বেশি। পার্থক্য শুধু এতটুকুই। এর অর্থ এই নয় যে, মুখাবয়ব সতরের অন্তর্ভুক্তই নয়। কিছু জ্ঞানপাপী লোক কুরআনে কারীমের একখানা আয়াতকে সামনে রেখে নারীদের চেহারা খোলা রাখতে পরামর্শ দেয়। অথচ কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান জানতে হলে কুরআন-সুন্নাহর সামগ্রিক জ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। কোন বিষয় সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি আয়াত থাকলে সব ক'টিকে সামনে রেখে এবং তার সাথে এ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য সকল হাদীসকে সামনে রেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। সে হিসেবে সূরা নূরের ৩১নং আয়াত ও সূরা আহযাবের ৫৩ ও ৫৯নং আয়াতের সামষ্টিক অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, নারীদের চেহারাও সতরের অন্তর্ভুক্ত। প্রমাণের জন্য দেখুন মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ (২২/১১), আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ (৪০/৩৪৩), তাফসীরে কুরতুবী (১৪/২২৭)।

অবশ্য ইহরাম অবস্থায় চেহারা কাপড়াবৃত না করে চেহারার পর্দা করা কঠিন কাজ। এতদসত্ত্বেও তা করতে হবে। নারীদের জন্য হজ্জকে জিহাদের সমতুল্য বলার যে সকল রহস্য রয়েছে পর্দার বিষয়টিও তার অন্তর্ভুক্ত। মুখ খোলা রেখে হারামের চত্বরে বসে গল্প করা আর পুরুষদের মত মুক্ত বায়ু গ্রহণ করার মধ্যে জিহাদ কোথায়! তবে হারামে, মাতাফে ও রাস্তাঘাটে এসব চেহারা খোলা নারীদের অবাধ বিচরণের কারণে এখন গুনাহমুক্ত হজ্জ করাটা পুরুষদের জন্য জিহাদ সমতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সর্বাধিক কঠিন অবস্থা দাঁড়ায় তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ বরাবর গিয়ে ডানে সবুজ বাতি দেখার সময়। বাতির দিকে দেখতে হয় হাজরে আসওয়াদের বরাবর রেখা নির্ণয় করার প্রয়োজনে। আর তখন হাজরে আসওয়াদের প্রতি হাত উঁচিয়ে ইশারাকারী ডান পার্শ্বের মুখখোলা নারীদের মুখদর্শন থেকে নিজেকে বাঁচানো কত কঠিন তা কেবল ভুক্তভোগীই বলতে পারে। অথচ ঐ নারীদের অধিকাংশই ইহরামমুক্ত অবস্থায় নফল তাওয়াফে লিপ্ত, যেখানে চেহারা খোলা রাখার কোন খোঁড়া অজুহাতও নেই। অনুরূপভাবে মসজিদে নববীতে জামাআতের আগে-পরে পুরুষদের স্রোত ভেদ করে নারীদের এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়ার সময় দৃষ্টির হিফাযত করাও জিহাদের চেয়ে কম কষ্টকর নয়।

আর সশব্দে তালবিয়া পাঠ, তাওয়াফ অবস্থায় তাকবীর বলা, দু'আ পড়ার বিক্ষোভ মিছিল, এগুলোর কোন কোনটায় নেতৃত্বই দিচ্ছে নারীরা। অথচ সূরা আহযাবের ৩২নং আয়াতের আলোকে পরপুরুষের ক্ষেত্রে নারীদের কোমল কণ্ঠও পর্দার অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এ সরব মিছিলের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী নারীরা এতটা পারদর্শী নয়। এক্ষেত্রে আমরা গর্বিত বাঙ্গালী।

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি পবিত্র হজ্জ ও উমরা আদায় করে থাকেন তাহলে নিশ্চয় একমত হবেন যে, এমন পবিত্রতম স্থানে অধিকাংশ নারীরা শয়তানের ফিতনায় আক্রান্ত আর পুরুষেরা ঐ সকল নারীদের ফিতনার সম্মুখীন। আল্লাহ তা'আলা উভয় শ্রেণীকে স্ব-স্ব ফিতনার মোকাবেলা করে উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফীক দান করুন।

খ.

শরীয়তমতে প্রাণীর ছবি তৈরি করা, সংরক্ষণ করা, প্রদর্শন করা নাজায়েয ও হারাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী প্রাণীর ছবি প্রস্তুতকারীরা কিয়ামতের দিন কঠিনতম শাস্তির যোগ্য হবে।

যে ঘরে উন্মুক্ত অবস্থায় প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

হাদীসে বর্ণিত বিষয় দু'টিতে কোন আলেমের দ্বিমত নেই। অবশ্য প্রাণীর ছবিমাত্রই নিষিদ্ধ ছবি, নাকি এর শ্রেণীভেদ আছে? তা নিয়ে কিছুটা দ্বি-মত আছে। বিশেষ করে ডিজিটাল ছবির ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, তা আয়নার প্রতিচ্ছবির মত একটি ছায়া; মূলত ছবি নয়। কিন্তু চিন্তা করলে মতটির দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা আয়নার ছবি মূলের অনুগামী হয়। অর্থাৎ মূল আছে তো ছবিও আছে, মূল নেই তো ছবিও নেই। পক্ষান্তরে ডিজিটাল ছবি মূলের অনুগামী নয়, কেননা তা মূলের অনুপস্থিতিতেও সংরক্ষণযোগ্য যা আয়নার ক্ষেত্রে অসম্ভব। তাছাড়া ছবির সর্বাধুনিক প্রযুক্তি– যা ছবি তৈরির উদ্দেশ্য ও মূলবস্তুর সাদৃশ্যের ব্যাপারটাকে প্রায় শতভাগ পূর্ণ করে দেয়, যেটা পুরনো কোন প্রযুক্তি দ্বারা সম্ভব নয়– এহেন পূর্ণাঙ্গ ছবি বৈধ হবে আর শুধু গাছের কাণ্ডের মত স্থির ও মূলের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমিল এমন ছবিই নিষিদ্ধ হবে এটা অধিকাংশ আলেমের মতে অযৌক্তিক। কাজেই সতর্কতার জোর দাবী হল, গ্রহণযোগ্য শরঈ ওজর ছাড়া প্রাণীর ছবি তোলা, সংরক্ষণ করা ও প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাদীসে পাকে এ মর্মে যে কঠোর ধমকি এসেছে তার প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস থাকলে বিনা প্রয়োজনে শুধু সখের বশে ছবি তোলার দুঃসাহস দেখানো সম্ভব নয়। আর যদি তা হয় পবিত্রতম স্থানে যেমন, মসজিদে, দীনী অনুষ্ঠানে, তাহলে তার খারাবী আরো

বেশি হবে। উপরন্তু তা যদি হয় হজ্জ করতে গিয়ে মসজিদে হারামে, বাইতুল্লাহকে পিছনে রেখে, সাফা-মারওয়ায়, মসজিদে নববীতে...!!

ছবি তোলার এ কাজটি নবীজীর রওযায় হলে তা যে কত বড় বেয়াদবী একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। এ সকল স্থানে ছবির কি ন্যূনতম প্রয়োজনও আছে? শুধুই ফালতু কাজ নয় কি? ফের যদি হয় স্বামী-স্ত্রী বা সফরসঙ্গী কিংবা পরিবারের সদস্যদের সাথে সেলফি ছবি, সেলফি তোলার সুবিধার্থে সংগৃহিত লম্বা ছড়ি, তাহলে এ কাজ কি একজন হাজীর জন্য আদৌ শোভা পায়? কিন্তু এ অন্যায়, অহেতুক কিংবা অন্ততঃ দৃষ্টিকটু এ কাজটি থেকে এখন ক'জন হাজীই বিরত থাকেন!?

প্রথম হজ্জের সফরে খতীব সাহেবের সামনা-সামনি জুমু'আর খুতবা শোনার জন্য প্রখর রোদে বড় কষ্ট করে মাতাফে বসেছিলাম। নির্দিষ্ট সময় খুতবা শুরু হলে সামনের দিকের বহু লোক ভিডিও করার আমলে লিপ্ত হয়ে গেল। ভিডিও চলতে থাকল খুতবার শেষ পর্যন্ত। এদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, এদের কারণে আমি কাছে থেকেও ইমামকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, আমি কি সত্যিই বাইতুল্লাহর চত্বরে আছি, নাকি কোন সী-বিচে? জুমু'আর খুতবা চলাকালে যেখানে খুতবা শোনা ছাড়া অন্য সকল কাজ এমনকি অন্য ইবাদতও নিষিদ্ধ হয়ে যায়, সেখানে বাইতুল্লাহর চত্বরেই খুতবা শোনা বাদ দিয়ে ছবি তোলার কাজ! এ-ও কি সম্ভব? এরকম অবিশ্বাস্য অনেক বেহুদা কাজ হজ্জ ও উমরা আদায়কারীগণ করে থাকেন। বুঝে আসে না, এদের কাছে হজ্জের তাৎপর্য কি নিছক ভ্রমণে যাওয়া, নাকি আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন? এমন কাজ করেও যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির আশা করা যায়, তাহলে শয়তান খুশি হবে কোন কাজ করলে? ছবি না তুলে চুপচাপ বসে খুতবা শুনলে?

বস্তুতঃ এ নাজায়েয ও বেহুদা কিংবা বেয়াদবীমূলক কাজের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলছে। আযানের সময়, তাওয়াফরত অবস্থায়, মাকামে ইবরাহীমে সর্বত্রই ভিডিও করা আর ছবি তোলার হিড়িক। এমনিতেই মনি-মুক্তা আহরণের স্থলে কাঁকর-পাথর আহরণ করা পাগলামীর লক্ষণ, সেক্ষেত্রে কেউ যদি জাহান্নামের শাস্তির কাজ করে তথা জ্বলন্ত অঙ্গার সংগ্রহ করে তাহলে তো তাকে পাগল বলাও মুশকিল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কাজ থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

গ.

ইমাম নববী রহ. বলেন,

إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة.

অর্থ : সগীরা গুনাহ বারবার করলে তা কবীর গুনাহ হিসেবে গণ্য হয়।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

ان العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله تعالى وكلما كبرت عنده صغرت عند الله تعالى.

অর্থ : বান্দা যদি কোন গুনাহকে সগীরা মনে করে তাহলে আল্লাহর নিকট তা কবীরা গণ্য হয়। আর বান্দা যে গুনাহকে কবীরা মনে করে আল্লাহ তা'আলার নিকট তা সগীরা গণ্য হয়।

আজ আমাদের অবস্থা হল কোন গুনাহের ব্যাপারে যখন কোন লোকের মারফতে জানতে পারি যে, বিষয়টি করলে সুন্নাত আমল হবে আর না করলে মাকরূহ হবে তখন যৌক্তিক কোন কারণ ছাড়াই সেটাকে প্রতিনিয়ত তরক করতে থাকি। সেটা কেমন যেন বর্জনীয় বিষয়ের তালিকাভুক্ত।

এ জাতীয় বিষয়ের অন্যতম উদাহরণ হল, দাড়ি রাখা। লোকমুখে প্রচলিত হল দাড়ি রাখা সুন্নাত। অথচ শরীয়তমতে ওয়াজিব। তর্কের খাতিরে সুন্নাত ধরে নিলেও বারবার দাড়ি মুণ্ডানো কবীরা গুনাহ এতে কারো দ্বিমত করার যুক্তি নেই। দাড়ি মুণ্ডনকারী সর্বদা কবীরা গুনাহের অভিযোগ বহন করে বেড়ায়; এমনকি ঘুমের মধ্যেও। পয়সা খরচ করে কিংবা কষ্ট করে অহেতুক এমন গুনাহে অভ্যস্ত হওয়ার কোন যুক্তি নেই। কারো স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়, কারো বস্ বা বন্ধুরা নারাজ হয় এমন তুচ্ছ ছলছুতায় এ গুনাহ করেই চলেছে এমন মুসলমানের সংখ্যা এখন নব্বই শতাংশেরও বেশী।

এ মর্মে আরেকটি মাসআলা হল, কোন বিষয় যদি সুন্নাত হিসেবে প্রমাণিত হয় তাহলে যতটুকু সুন্নাত হিসেবে প্রমাণিত তার চেয়ে কম হলে সাধারণত সুন্নাত আদায় হয় না। যেমন যোহরের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। কোন মুসল্লী যদি এক্ষেত্রে এক রাকাআত বা দুই রাকাআত কিংবা তিন রাকাআত সুন্নাত পড়ে তাহলে তার যোহরের পূর্বের সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আদায় হবে না। দাড়ি কেটে ছেটে একমুষ্টি তথা চার আঙ্গুলের কম করে রাখার কোন প্রমাণ কোন হাদীসে নেই। তাহলে যারা দাড়ি কেটে এক আঙ্গুল, দু-আঙ্গুল বা তিন আঙ্গুল পরিমাণ রাখে তারা কী করে দাড়ির সুন্নাত পালনকারী গণ্য হবে এবং সুন্নাত কাটার গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে?

অনেকে এ গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার পর এখন অনুতপ্ত বটে; কিন্তু ছেড়ে দেয়ার হিম্মত পায় না, পরিবেশ প্রতিকূলতার কারণে। পবিত্র হজ্জের সফর তাদের এ ত্রুটি থেকে মুক্তি লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়া হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য গুনাহমুক্ত হজ্জ হওয়া আবশ্যক। যারা রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা এ গুনাহের ধারক বাহক, তাদের গুনাহমুক্ত হজ্জ করার সুযোগ কোথায়? বুযুর্গগণ বলে থাকেন, দাড়ি মুণ্ডনকারীরা ১০ই যিলহজ্জ মাথা মুণ্ডনের সাথে দাড়ি মুণ্ডন করে নিজ নিজ হজ্জকে মিনার ময়দানেই রেখে আসে। হজ্জকে সাথে নিয়ে আসার তাওফীক তাদের হয় না। কথাটা কি সম্পূর্ণ বেঠিক? আবার কেউ দেশে এসে হজ্জ সাফ করার কাজে হাত দেয়।

প্রথম হজ্জের সফরে মক্কা শরীফে কক্সবাজার হোটেলের সামনে ঘন কালো দাড়িওয়ালা এক সুদর্শন যুবককে দেখে আমি চিনতে পারিনি। 'হুযূর! আসসালামু আলাইকুম..., কেমন আছেন'– বলে মুসাফাহা করার পরও যখন তিনি বুঝলেন, আমার কাছে তার পরিচয় স্পষ্ট হয়নি, তখন নিজেই নাম-ঠিকানা বলে দিলেন। চিনতে না পারার কারণ ছিল এ সফরের শুরু থেকে তিনি দাড়ি না মুণ্ডানো। প্রায় একমাস বয়সী দাড়ি তার মুখাবয়বকে এতো জ্যোতির্ময় করে তুলেছিল যে, দেখে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে গেলাম। বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার এ সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করুন।

দেশে ফেরার কিছুদিন পরে পুনরায় তার বাসার সামনে সাক্ষাত হলে পুনরায় না চিনতে পারার ঘটনা ঘটল। কিন্তু সে সুন্দর দাড়ির পূর্ণতায় নয়; শূন্যতায়। আমাকে দেখে তিনি লজ্জা পাচ্ছিলেন; বরং আমিই লজ্জিত হলাম তাকে লজ্জাবনত হতে দেখে! জিজ্ঞেস করলাম, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! এমনটা কেন হল? বিনীত কণ্ঠে বললেন, পরের অধীনে চাকরি করি তো কিছু বিষয় ইচ্ছা থাকলেও করতে পারি না। আমি মনের ব্যথায় একটু হাসলাম এবং নির্বাক বিদায় নিলাম।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মত এমন কৈফিয়ত অনেকেই পেশ করে থাকেন। কিন্তু ভেবে দেখুন না! আমরা শুধু মাখলূকের চাকরিই করি, না খালিকের তথা সৃষ্টিকর্তার চাকরিও করি? যে মাখলূকের

অধীনে আমরা চাকর, সে-ও সেই খালিকেরই চাকর। খালিক হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বস্, সকল বস্দেরও বস্। দুনিয়ার বসেরা কেউ আমাদের মালিক বা রিযিকদাতা নন। মহান খালিক আমাদের মালিকও, রিযিকদাতাও। কাজেই তাঁকে অসন্তুষ্ট করে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার দু-চার পয়সা পেলেও পরকালে যেখানে এ সকল বস্রাই থাকবে দৌড়ের উপর সেখানে আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা কী হবে?

২০০৯ সালের পর তার সাথে আমার নয় বারও সাক্ষাত হয়নি। অথচ তিনি আমার পাশেই থাকেন। সে হিসেবে আমার সাথে বছরেও সাক্ষাত না হওয়া ভালো অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে না। সম্ভবত হাজী সাহেব এখন নামাযেও দুনিয়ার বস্দের সাথে আপোষ করার নীতি অবলম্বন করেছেন। এমন হাজী সাহেব এখন যত্রতত্র।

মূলত ইসলাম হল আল্লাহর আনুগত্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণের নাম। অপূর্ণ আনুগত্যে শয়তান সুযোগ নেয়। এভাবে একসময় শয়তান আল্লাহর আনুগত্যকে পূর্ণরূপে ভুলিয়ে দেয়। সুন্নাত-মুস্তাহাব তো দূরের কথা, ফরয-ওয়াজিবও ধরে রাখা যায় না। পক্ষান্তরে সুন্নাত-মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে শয়তান ও শয়তানের মিত্রদেরকে পাত্তা না দিলে ফরয-ওয়াজিবে কুমন্ত্রণা দেয়ার চিন্তা ছেড়ে দেয়। তাই সুন্নাত-মুস্তাহাবকে কখনো অবহেলা করতে নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সুন্নাহসম্মত জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

ঘ.

সুন্নাহসম্মত পোশাকের মধ্যে পুরুষদের জন্য জুব্বা অন্যতম। হাজী সাহেবগণ হজ্জে গিয়ে শখ করে জুব্বা ক্রয় করে থাকেন। দেশে এসে ঈদ, জুমু'আ ও ওয়ায-মাহফিলে জুব্বা পরে অংশগ্রহণ করেন। বেশ ভালো কথা। সাথে লাল বা সাদা রুমাল হলে আরো ভালো মানায়। আর যদি রুমালের উপর কালো বেড়ি লাগায় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু সমস্যা হল দু'টি বিষয় নিয়ে। (এক) অধিকাংশ হাজী সাহেব এ জুব্বা পায়ের গিরার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরেন। অথচ শরীয়ত মতে পুরুষদের জন্য পায়ের গিরার নিচে ঝুলিয়ে কোন পোশাক পরা নাজায়েয ও হারাম। চাই সেটা যমযমের পানিতে ধোয়া জুব্বাই হোক না কেন। এ মাসআলা বললে সাধারণ হাজীরা সৌদি আরবের লোকদের উদাহরণ তুলে ধরতে চান। তাদের মতে সৌদি আরবের সবাই আলেম। যেহেতু তারা জুব্বা পরে, আরবীতে কথা বলে এবং মক্কা-মদীনায় বাস করে। এ ধারণা কিন্তু একদম গলত। সৌদি আরবের আলেমরাও সুন্নাতের পাবন্দী করেন, সুন্নাত অনুযায়ী দাড়ি রাখেন, পায়ের গিরার উপরে জুব্বা পরেন। সেখানে যারা দাড়ি ছাটে এবং গিরার নিচে ঝুলিয়ে জুব্বা পরে সাধারণত এরা আমাদের দেশের ঐ পর্যায়ের লোকদের মত যারা গিরার নিচে ঝুলিয়ে প্যান্ট পরে কিংবা হাফপ্যান্ট পরে তথা একেবারেই আম জনতা। এরা আমাদের অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই হাজী সাহেবদের জুব্বা অবশ্যই গিরার উপরে পরতে হবে। বড় ক্রয় করে থাকলে তা কেটে ছোট করে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, পুরুষদের জন্য গিরার নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করা অহঙ্কারের নিদর্শন। অহঙ্কার ছাড়া এর যৌক্তিক কোন কারণ নেই। কেউ অহঙ্কার অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু অহঙ্কার যেহেতু স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণ করার বিষয় নয়, কাজেই এক্ষেত্রে অস্বীকার করাও গ্রহণযোগ্য নয়। লক্ষণ দ্বারাই প্রমাণিত হবে, কে অহঙ্কারী আর কে বিনয়ী।

জুব্বাধারী হাজী সাহেবদের আরেকটা সমস্যা হল, তাদের কেউ কেউ নিজেকে আলেম ভাবতে শুরু করে। এটা এমন এক হাস্যকর বিষয় কথায় যাকে বলে লাল দেখলেই যেন দুলাভাই। আমাদের বোর্ডিংয়ের একজন স্টাফ কাজে যোগদানের দিন ফার্মাসিস্টদের একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছিলেন। যা দেখে তার সহকর্মীরা তাকে ডাক্তার খেতাব দিয়েছিল। সেই থেকে অদ্যাবধি তিনি ডাক্তার নামেই পরিচিত। শিক্ষকদের অনেকেই তার আসল নামটুকু জানেন না; ছাত্ররা তো কেউই জানে না। আলোচ্য হাজী সাহেবদের অবস্থাও তাই। জুব্বা-রুমালে মানানসই হাজী সাহেবকে মানুষ সম্মান করতে শুরু করলে তার মধ্যেও আলেম আলেম ভাব চলে আসে; বরং ক্ষেত্রবিশেষে আলেমদের উপরে কর্তৃত্ব করতে মনে চায়। মসজিদ-মাদরাসার কমিটির সদস্য হতে আগ্রহ জাগে। সভাপতি, সেক্রেটারি হতে পারলে তো আরো ভালো হয়। অন্যরা তাকে আগে ভাগে সালাম না দিলে মাইন্ড করে। এটাও হজ্জের একটা সাইডএফেক্ট। এ থেকে বাঁচতে না পারলে হজ্জের পুণ্য ধরে রাখা মহামুশকিল হবে। আল্লাহ তা'আলা সকল হাজী সাহেবানকে এর থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন।

ঙ.

হাজী সাহেবদের অপ্রয়োজনীয় মার্কেটিং। বিশেষ করে মদীনা শরীফে যেমন দোকান-পাট বেশি, তেমনি হাজী সাহেবদের হাতে সময়ও থাকে প্রচুর। প্রত্যেকে বাসায় ফেরার সময় কিছু না কিছু নিয়েই ফেরে। গত হজ্জের সফরে আমাদের কিছু সাথী প্রায়ই 'কেউ ফেরে না খালী হাতে' (খাজাবাবার গানের অংশ)-র সুর তুলতেন।

হজ্জের সফরে কেনাকাটা যত কম করা যায় ততই ভালো। খেজুর, রুমাল, আতর, তাসবীহ, বোরকা, হিজাব এ জাতীয় টুকিটাকির বাইরে না গেলেই হয়। কম্বলের বিষয়টি তো 'দিল্লী কা লাড্ডু'র মত, যে কিনে সে-ও পস্তায়, যে না কিনে সে-ও পস্তায়। একবার ময়লা হলে বা নাপাকি লাগলে পরিস্কার করা যে কত কষ্টকর তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। আর ড্রাইওয়াশ তো মূলত আইওয়াশ। পরিস্কার কেমন হয় আল্লাহই ভালো জানেন। শীত বস্ত্রের মধ্যে আমাদের দেশীয় লেপের কোন জুড়ি নেই। এলার্জির আশঙ্কা নেই, ময়লা হলে কভার ধুয়ে নিলেই হল। কাজেই কম্বলের ঝামেলা আর না হলেই ভালো হয়।

আরেক 'দিল্লী কা লাড্ডু' হল, মদীনা শরীফের অদূরে ওয়াদিউল জিন বা জিন পাহাড় দেখতে যাওয়া। প্রসিদ্ধ আছে যে, সেখানে পানি ফেললে বা পানি ভর্তি বোতল যমীনে রাখলে উপরের দিকে গড়ায়। কথাটি শতভাগ মিথ্যা, যার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আরেকটি কথা আছে যে, সেখান থেকে ফেরার পথে বন্ধ গাড়িও ৮০ কিলোমিটার বেগে সামনে দৌড়ায়, শুধু স্টিয়ারিং ধরে রাখলেই চলে। ইঞ্জিন চালু করা লাগে না। যদিও বিষয়টির ব্যক্তিগত যাচাই আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু অভিজ্ঞতার দাবীদারকে যখন প্রশ্ন করি, আসার পথে যখন বন্ধ ইঞ্জিনেও গাড়ি সামনে চলে তো যাওয়ার সময় কোন পিছুটান অনুভব করেছেন কিনা? এ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক উত্তর আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। তাহলে আসার পথে বন্ধ ইঞ্জিনে গাড়ি চলার দাবী কী করে যৌক্তিকতা পায়! একটু ভেবে দেখার দরকার আছে। মোটকথা জিন পাহাড় দেখতে যাওয়াও নেহাত বেহুদা কাজ; যা যাওয়ার পর ভালোভাবে বুঝে আসে। কাজেই না গেলেই ভালো।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : নায়েবে মুফতী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

তিনটি বড় গুনাহ : বদযবানী, বদনেগাহী, বদগুমানী

কারী আমীর হাসান রহ.

মুরাদাবাদ। একটি প্রসিদ্ধ শহর। ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি জেলা। এ শহরেই অবস্থিত প্রসিদ্ধ একটি মাদরাসা। মাদরাসায়ে শাহী। গোটা মাদরাসা জুড়ে সেদিন ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। থানবী বাগানের সর্বশেষ ফুল হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহ.। তারই দীর্ঘ ষাট বছরের অধিক সোহবতপ্রাপ্ত দীনী রাহবার ও হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর প্রথম সারির খলীফা হযরত মাওলানা কারী আমীর হাসান রহ.। তিনি জামি'আয় আগমন করেছেন। সে সুবাদে পুরো জামি'আ জুড়ে আনন্দের ঢেউ বয়ে চলছে। মসজিদ প্রাঙ্গনে আসাতিযায়ে কেরাম ও তলাবায়ে ইযামের একটা বড় মজমা তার মুখনিঃসৃত কিছু নসীহত শোনার জন্য সমবেত হয়েছে। পিনপতন নীরবতা। হযরত রহ. হামদ ও সালাতের পর সেদিন যা বলেছিলেন তার সারসংক্ষেপ এই-

তিনটি বড় বড় গুনাহ এমন রয়েছে, যদি আল্লাহর কোন বান্দা সতর্ক হয়ে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে তার জন্য অন্যান্য সকল গুনাহ হতে বেঁচে থাকা সহজ হবে। সে আল্লাহ তা'আলার ওলী ও নৈকট্যশীল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে। গুনাহ তিনটি এই-

১. বদযবানী অর্থাৎ কুকথা।
২. বদনেগাহী অর্থাৎ কুদৃষ্টি।
৩. বদগুমানী অর্থাৎ কুধারণা।

এরপর হযরত প্রতিটি গুনাহের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেন।

বদযবানী

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে যবান তথা জিহ্বার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ছোট এ অঙ্গটি যদি সঠিক পথে পরিচালিত হয় তাহলে তা মহাসম্মান ও সুমহান মর্যাদা হাসিলের মাধ্যম ও উসিলা হয়। পক্ষান্তরে যবান তথা জিহ্বা যদি নির্লজ্জ হয় ও খোদাভীতির পরোয়া না করে নিষিদ্ধ কথাবার্তা বলে বেড়ায় তাহলে তা মানুষের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও বঞ্চনার কারণ হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.

অর্থ : মানুষ যখন ঘুম থেকে ওঠে, অন্যান্য সকল অঙ্গ জিহ্বাকে লক্ষ্য করে বিনয়াবনত হয়ে বলে, আল্লাহকে ভয় করো। কারণ আমরা তোমার সঙ্গী। তুমি সঠিক পথে চললে আমরাও সঠিক পথে চলব। আর তুমি বাঁকা পথে চললে আমরাও বাঁকা পথে চলব। (সুনানে তিরমিযী ২/৬৬)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল, মানব জীবনে জিহ্বার গুরুত্ব অপরিসীম। এর সহীহ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ জরুরী। আর এজন্যই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর তাকীদ দিয়ে জিহ্বা হেফাযতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ করেছেন,

'যে ব্যক্তি (ভুল বা অন্যায় কথা না বলে) চুপ থাকল সে নিরাপদ থাকল।' (সুনানে বাইহাকী; হা.নং ৪৯৮৩)

'জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। তোমার ঘরই যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয় (অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে না) এবং নিজের গুনাহের কারণে ক্রন্দন করো।' (সুনানে তিরমিযী ২/৬৬)

এ রকম বহু হাদীস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, জিহ্বার ব্যবহারে প্রতিটি মানুষকে খুব সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। নতুবা সামান্য অসতর্কতায় বড় ধরনের বিপদে পড়ে যেতে পারে।

জিহ্বার মাধ্যমে যেসব গুনাহ প্রকাশ পায় সেগুলোর বিবরণ একত্রে লিপিবদ্ধ করা কঠিন। তা সত্ত্বেও ইমাম গাযালী রহ. এর ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন কিতাবের আলোকে কিছু উল্লেখ করা হল-

১. অপ্রয়োজনে কথা বলা।
২. প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলা।
৩. হারাম জিনিসের পর্যালোচনা করা। যেমন চলচ্চিত্র কাহিনী, নাজায়েয খেলাধুলা ইত্যাদি।
৪. অশ্লীল কথাবার্তা বলা।
৫. উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলা।
৬. অন্যকে অভিশাপ দেয়া।
৭. অবৈধ হাসি-ঠাট্টা করা।
৮. গান ও অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করা।
৯. অন্যকে বিদ্রুপ করা।
১০. অন্যের গোপন বিষয় প্রকাশ করা।
১১. মিথ্যা ওয়াদা করা।
১২. পরনিন্দা করা।
১৩. দু'মুখো কথা বলা।
১৪. অযোগ্য ব্যক্তির প্রশংসা করা ইত্যাদি।

তবে জিহ্বার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ভয়াবহ ও ব্যাপক গুনাহ আছে যার কিছু এই-

মিথ্যা

জিহ্বার দ্বারা সংঘটিত গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ও নির্লজ্জ গুনাহ হল মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। পবিত্র কুরআনে মিথ্যাবাদীকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ.

অর্থ : অতঃপর আমরা মিথ্যাবাদীকে আল্লাহর লা'নত দিই। (সূরা আলে ইমরান- ৬১)

إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به؟

অর্থ : যখন বান্দা মিথ্যা কথা বলে তখন মিথ্যা কথার দুর্গন্ধে রহমতের ফেরেশতা তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। (সুনানে তিরমিযী ২/১৮)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় মিথ্যা কত জঘন্য অপরাধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন,

ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له.

অর্থ : যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে সে ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক। (আবূ দাউদ শরীফ; হা. নং ৪৯৯২)

আজকাল মানুষ অন্যকে হাসানোর জন্য নতুন নতুন কৌতুক তৈরি করে। শুধু মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। উল্লিখিত হাদীসের সতর্কবাণী তাদের জানা থাকা উচিত এবং এ ধরনের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

আরেক হাদীসে আছে,

كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب.

অর্থ : এটি খুব বড় খেয়ানত যে, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তুমি এমন কথা বলবে, যে বিষয়ে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করবে অথচ তুমি মিথ্যাবাদী। (সুনানে

আবূ দাউদ; হা. নং ৪৯৭৩) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন।

সত্যের মাঝেই মুক্তি

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল, প্রত্যেক কাজে সততা অবলম্বন করা ও মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা। এ গুণের উসিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে লজ্জা করার অনুপ্রেরণা জাগ্রত হয় এবং সৎ কাজের তাওফীক পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যা কথা বললে চরম ক্ষতি ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়। মিথ্যার মাধ্যমে হয়ত সাময়িক কোন ফায়দা হয়; কিন্তু পরিণাম বিবেচনায় তা মুক্তির মাধ্যম হতে পারে না। অন্যদিকে অনেক সময় সত্য বলার কারণে সাময়িক ক্ষতি অনুভূত হলেও পরিণাম খুবই কল্যাণকর ও উপকারী হয়ে থাকে।

হযরত উমর ফারূক রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী বর্ণনা করেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত হাসি-তামাশায়ও মিথ্যা ছেড়ে না দেয় এবং ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ না করে; যদিও সে ন্যায়ের পথেই থাকুক না কেন। (মুসনাদে আহমাদ; হা. নং ৮৬৩০)

ব্যবসায়ী ভাইয়েরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন

আজকাল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মন খুলে মিথ্যা কথা বলা হয় এবং এতে কোনরূপ গুনাহ হওয়ার অনুভূতি থাকে না। ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, পণ্য বিক্রি হতে হবে। এতে মিথ্যা বলার দরকার হলে তা-ও বলতে হবে। গ্রাহককে প্রলুব্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আর সামান্য লাভের আশায় নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করে ফেলে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق.

অর্থ : মুত্তাকী, সৎ ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী ব্যতীত অধিকাংশ ব্যবসায়ীকে কিয়ামতের দিন গুনাহগার অবস্থায় উঠানো হবে। (আল-মুসতাদরাক লিলহাকেম; হা.নং ২১৪৪)

আমাদের অভ্যাস

১. বর্তমানে সাধারণত দোকানদার নিজের পণ্য বিক্রির জন্য নিম্নমানের পণ্যকে উত্তম বলে।

২. মূল্যের ক্ষেত্রে বেধড়ক মিথ্যা বলে। এভাবে বলে যে, এ দামে তো আমি কিনতেই পারিনি; যাতে গ্রাহক প্রভাবিত হয়ে অধিক মূল্যে ক্রয় করে।

৩. গ্রাহক যদি নির্দিষ্ট কোন কোম্পানীর পণ্য চায় আর তা দোকানীর কাছে না থাকে তাহলে সে একথা বলে না যে, আমার নিকট এই কোম্পানীর পণ্য নেই আপনি অন্য দোকান থেকে সংগ্রহ করে নিন। বরং নিজের পণ্য চালিয়ে দেয়ার জন্য একথা বলে গ্রাহককে ধোঁকা দেয় যে, আপনি যে কোম্পানীর পণ্য চাচ্ছেন তা এখন বাজারে পাওয়া যায় না; অন্য কোম্পানীরটা নিন।

৪. পুরাতন পণ্যের গায়ে নতুন লেভেল বা স্টিকার লাগিয়ে দেয়।

৫. পণ্যের প্রশংসায় আসমান-যমীন এক করে ফেলে।

মোটকথা, এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাতে গ্রাহক বা ক্রেতা পণ্য ক্রয়ে বাধ্য হয় এবং ব্যবসায়ী এতেই নিজেকে সফল মনে করে। এটা দীনের প্রতি অনাগ্রহ, অনাসক্ত ও লা-পরওয়া হওয়ার প্রমাণ। মিথ্যা সর্বদাই মিথ্যা। মিথ্যা যে সময়ই বলা হোক, যে অবস্থায়ই বলা হোক গুনাহ হবেই। কাজেই ব্যবসায়ী ভাইদের উচিত নিজেদের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা।

যদি তারা এক আল্লাহর উপর ভরসা করে সততা ও দীনদারীর সাথে রোযগার করে তাহলে দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বে-হিসাব বরকত দান করবেন এবং আখেরাতেও তাদের হাশর করাবেন আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও নেককার বান্দাদের সাথে।

গীবতও এক ধরনের বেহায়াপনা

জিহ্বার সাহায্যে যেসব গুনাহ প্রকাশিত হয় এবং যে গুনাহর সাহায্যে স্পষ্টত আল্লাহর সঙ্গে নির্লজ্জতার প্রমাণ পাওয়া যায় তেমন একটি মারাত্মক গুনাহের নাম হল গীবত। গীবত নামক ব্যাধি আজকাল চা-স্টল থেকে শুরু করে দস্তারবন্দীর মোবারক মাহফিল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আজকাল গীবত ব্যতীত মজলিস জমে ওঠে না। আলোচনা চটকদার করার জন্য সাধারণত গীবতের আশ্রয় নেয়া হয়।

এ ব্যাধিটি এত ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, তা গুনাহ ও অন্যায় হওয়ার অনুভূতিও অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে। সমাজের এই অধঃপতিত অবস্থা শুধু হতাশার নয়; বরং রীতিমত ভয়াবহ। গীবত থেকে বেঁচে থাকা এবং তা থেকে বিরত থাকার অনুপ্রেরণা তখনই জাগ্রত হতে পারে যখন উল্লিখিত হাদীস (فليحفظ الرأس وما وعى) এর বিষয়বস্তু সর্বদা মাথায় থাকবে এবং সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে লজ্জা করার প্রচেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি এ ভয়াবহ ও জঘন্য আত্মিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বদা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিনয়াবনত হয়ে দু'আ করতে হবে। বর্তমানে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত ব্যতীত এ ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে গীবত করা

উলামায়ে কেরাম তথা দীনের কাণ্ডারী ব্যক্তিবর্গের গীবত করা জনসাধারণের গীবত করার তুলনায় জঘন্য ক্ষতিকর। এর কারণ হল, উলামায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি মর্যাদাবান। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

من عادني لي وليا فقد اذنته بالحرب.

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি। (সহীহ বুখারী; হা. নং ৬১৩৭)

উলামায়ে কেরামের গীবত করলে মানুষ চরম শাস্তির সম্মুখীন হয়। যার শাস্তি আল্লাহ তা'আলা শুধু আখেরাতে নয়; বরং দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন। যারা এ ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দেয় তারা কুদরতীভাবে অপদস্থ হয়। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজেকে আল্লাহর তা'আলার আযাব থেকে বাঁচানো।

ইমাম গাযালী রহ. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে লিখেছেন, কারো গীবত বা নিন্দা শুনলে ছয়টি কাজ করবে-

১. চোগলখোরের কথা কখনো বিশ্বাস করবে না। কারণ সে শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক।

২. চোগলখোরকে তার হীন কর্মের জন্য সতর্ক করবে এবং তাকে লজ্জা দিবে।

৩. চোগলখোরের কাজকে মন থেকে ঘৃণা করবে।

৪. যার চোগলখোরী করা হয়েছে তার পক্ষ থেকে মন্দ ধারণা যেন না হয়।

৫. চোগলখোরের কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাবে না এবং তার সত্যতা যাচাই করবে না।

৬. চোগলখোরের এ কাজকে অন্যত্র বর্ণনা করবে না। অন্যথায় নিজেই চোগলখোর হয়ে যাবে।

গালি-গালাজ এবং অশ্লীল কথাবার্তা

জিহ্বা থেকে প্রকাশ পায় এমন জঘন্য গুনাহের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্তাও অন্তর্ভুক্ত। অশ্লীল কথাবার্তা কোন মুমিন ব্যক্তির মুখে মানায় না। জিহ্বার সাহায্যে যারা অপরকে কষ্ট দেয় কুরআনে কারীমে

তাদেরকে কঠিন গুনাহে লিপ্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

অর্থ : যারা মুমিন নর-নারীকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। (সূরা আহযাব- ৫৮)

বদনেগাহী

শরীয়তের দৃষ্টিতে মাথা হেফাযতের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দৃষ্টিকে গুনাহ থেকে হেফাযত করা। চোখের একটি অসতর্কতা মানুষকে বড় বড় গুনাহে লিপ্ত করে ফেলে। বর্তমান পৃথিবীতে বেহায়াপনা-অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার যে ছড়াছড়ি এর সবচে বড় কারণ হল কুদৃষ্টি। শয়তান মানুষের হাতে কুদৃষ্টির অস্ত্র তুলে দিয়ে ফুরফুরে মেজাযে রয়েছে। এখন মানুষের মাধ্যমে বড় বড় কুফরীর কাজ করাতেও তার বেশি কষ্ট করতে হয় না। কুদৃষ্টিই শয়তানের মনোবাসনাকে পরিপূর্ণরূপে আঞ্জাম দেয়ার কাজ দেয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার আলোকে সহজেই অনুমেয় যে, বর্তমান পৃথিবীর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সত্তর শতাংশ এ কারণে সংঘটিত হয় যে, এখন সন্তানদেরকে যথারীতি সিনেমা হল, টিভি প্রোগ্রাম ও ভিডিও সিডির মাধ্যমে লালন-পালন করা হয়। এসব চিত্তাকর্ষক বস্তুর মাধ্যমে শয়তান মানুষের দিল-দেমাগ থেকে লজ্জার বীজ মূলোৎপাটিত করেছে। মর্যাদাবান লোকদের মান-মর্যাদা ধুলোয় ধুসরিত করেছে। দীনদার লোকদের সম্ভ্রম কালিমাযুক্ত করেছে। এ কুদৃষ্টির কারণে তাকওয়া পরহেযগারীর সুউচ্চ মিনারে ফাটল ধরে এবং একটু অসতর্কতার কারণে সারা জীবনের নেক কাজগুলো তুষানলে ভস্ম হয়ে যায়।

ইসলাম কুদৃষ্টি নামক এ জঘন্যতম গুনাহের অশুভ পরিণাম ও ভয়াবহতাকে অনুভব করে কুদৃষ্টির সকল পথকে বন্ধ করার জোর নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফে দীপ্তমান নির্দেশনা এ বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ.

অর্থ : হে নবী! মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। (সূরা নূর- ৩০)

এমন নির্দেশ মুসলমান নারীদেরকে দেয়া হয়েছে, ‘তারা যেন নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে’।

এছাড়া সূরা আহযাবের আয়াতসমূহে পর্দার যে বিধান দেয়া হয়েছে তা-ও কুদৃষ্টির পথ বন্ধের ভূমিকা পালন করে। ইসলাম এ সকল বিধানকে ওয়াজিবের স্তর দান করার মাধ্যমে দীন ইসলামকে একটি সমৃদ্ধশীল ও সত্যিকারার্থে আমলযোগ্য মাযহাবরূপে প্রকাশ করেছে। ইসলাম সকল অপরাধ কর্মকাণ্ডের মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর। তাই এর ব্যবস্থাপনাও ইসলাম প্রস্তুত করে রেখেছে। বর্তমান পৃথিবীর খ্যাতনামা সভ্য সুশীল সমাজের মত নয়, যারা অশ্লীলতা রোধে কনফারেন্স, র‌্যালি ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ডুবে থাকে। কুরআন ও হাদীস অশ্লীলতার মূলভিত্তি তথা অসতর্ক দৃষ্টিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয়। এটা এমন এক শিক্ষা, যদি শুধুমাত্র দৃষ্টিকেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তবে পৃথিবী থেকে সকল নির্লজ্জতার অপসারণ ঘটবে। এ কারণে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুদৃষ্টিকে শয়তানের বিষাক্ত তীর সাব্যস্ত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان فمن تركها مخافتي أعقبته عليها إيمانا يجد طعمه في قلبه.

অর্থ : কুদৃষ্টি শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর। যে আমার ভয়ে তা বর্জন করবে আমি এর বিনিময়ে তাকে এমন ঈমান দান করব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে। (আত-তারগীব ৩/২৩)

বদগুমানী বা কুধারণা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে মুমিন সকল! তোমরা অনেক রকম ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ।’ (সূরা হুজুরাত- ১২)

আয়াতের কারীমার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি তার বান্দাদেরকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করেছেন যা সম্পূর্ণ হারাম। প্রথমতঃ ظن তথা ধারণা সম্পর্কে বলেছেন যে, অনেক রকম ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ হিসেবে বলেছেন, কতক ধারণা পাপ। সুতরাং আয়াত থেকে বোঝা যায়, সব ধারণাই পাপ নয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কারো প্রতি সুধারণা রাখা সওয়াবের কাজ। অতএব কারো প্রতি কুধারণা রাখা হারাম ও নিষিদ্ধ হবে। আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে সকল মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয় তাদের ব্যাপারে প্রমাণ ছাড়া কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. এর রেওয়ায়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.

অর্থ : তোমরা কুধারণা হতে বেঁচে থাকো। কেননা বদগুমানী তথা কুধারণা জঘন্যতম মিথ্যা। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৮৪৯, আল-আদাবুল মুফরাদ; হা.নং ১২৮৭, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৭২১, মুসনাদে আহমাদ ৩/১০২)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে কারো প্রতি কুধারণা পোষণ করা কত বড় জঘন্যতম অপরাধ। অথচ সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখে। যেমন তিনি বলেন,

ظنوا بالمؤمنين خيرا.

অর্থ : তোমরা মুমিনদের ব্যাপারে সুধারণা রাখো। (তাফসীরে কাবীর ১৪/১৩৪)

উলামায়ে কেরাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যদি কারো সম্পর্কে কুধারণার পক্ষে নিরানব্বইটি প্রমাণ থাকে, আর একটিমাত্র পথ থাকে সুধারণা পোষণের পক্ষে, তবে তুমি সুধারণা পোষণের রাস্তা অবলম্বন করো। এটাই তোমার জন্য নিরাপদ।

বদগুমানকারী দরবারে ইলাহীর আসামী

কুধারণার ফলে কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ পাক কুধারণাকারীর বিরুদ্ধে মুকাদ্দামা দায়ের করবেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করবেন, ‘তুমি যে আমার এ বান্দার প্রতি কুধারণা করেছিলে, বলো, সে ধারণার পক্ষে তোমার কাছে কি কি দলীল আছে?’

কত বড় চিন্তার কথা! আল্লাহর মুখোমুখি হওয়া! অথচ কারো প্রতি সুধারণা করলে বিনা দলীলে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন। সুধারণার জন্য দলীল-প্রমাণ ছাড়াই সওয়াবের অধিকারী হবে। কেননা সুধারণা রাখা প্রিয় নবীজীর হুকুম।

(৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জনগণকে দীনদার বানানোর মাদরাসা ভিত্তিক কর্মসূচী

মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ বিশেষত জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষা সমাপনকারী উলামায়ে কেরাম মাদরাসার পার্শ্ববর্তী জনসাধারণকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দীনদার বানানোর ফিকির করবেন।

১. মাদরাসায় প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট তারিখে দাওয়াতুল হকের মাসিক ইজতিমা করা। কেন্দ্রের পক্ষ হতে মাদরাসা এলাকায় প্রতি মাসে চারটি গাশতী মাহফিল করা। প্রতি ছয় মাসে একবার আঞ্চলিক উলামা সম্মেলনের আয়োজন করা। মাদরাসার সকল ছুটির সময় ছাত্রদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দীনী কাজের প্রোগ্রাম দেয়া এবং মাদরাসা খোলার পর তাদের কাছ থেকে শ্রেণী ভিত্তিক লিখিত ও মৌখিক কারগোযারী গ্রহণ করা।

২. প্রতি বৃহস্পতিবার দরসের পর থেকে শুক্রবার আসরের পূর্ব পর্যন্ত তালিবে ইলমদের চব্বিশ ঘণ্টার জামাআত বের করা। প্রতিদিন বা'দ ইশা হায়াতুস সাহাবা অথবা হেকায়াতে সাহাবা থেকে তা'লীম করা। প্রতি ছুটিতে ছাত্র-শিক্ষকদের কমপক্ষে তিনদিনের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে বের হওয়া এবং দীর্ঘ ছুটিতে চিল্লার জন্য তাশকীল করা।

৩. মাদরাসার পার্শ্ববর্তী মহল্লাগুলো উস্তাদদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া। তিনি সম্ভব হলে প্রতিদিন, অন্তত সপ্তাহে তিনদিন নিজ মহল্লায় গিয়ে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা দীনী তা'লীম করবেন।

৪. প্রত্যেক মাদরাসায় তিন মাসের দীনী তা'লীমের কোর্স চালু করা। এই কোর্সে জনসাধারণকে কুরআনের বিশুদ্ধ তা'লীম ও দীনের জরুরী ইলম শিক্ষা দেয়া হবে।

৫. প্রত্যেক মাদরাসায় ইসলামী পাঠাগার চালু করা। এই পাঠাগারে দেওবন্দী আকাবির বা হক্কানী উলামায়ে কেরামের রচিত গ্রন্থাবলী একাধিক কপি করে রাখা হবে। একজন উস্তাদকে এর তদারকির দায়িত্ব দেয়া হবে। তিনি নির্দিষ্ট খাতায় নাম-ঠিকানা লিখে জনগণের মাঝে বই-কিতাব বিতরণ করবেন এবং পাঠ শেষে তা উসূল করবেন। তাছাড়া কেউ দীনী বই কিনে সংগ্রহ করতে চাইলে এই পাঠাগারে তারও ব্যবস্থা রাখা হবে।

৬. প্রত্যেক মাদরাসায় ফাতাওয়া বিভাগ চালু করা। এ বিভাগ থেকে জনগণকে জরুরী মাসাইলের সমাধান দেয়া। এ কাজে কোন বিজ্ঞ মুফতী সাহেবকে দায়িত্ব প্রদান করা।

বি.দ্র. উল্লিখিত কাজগুলোর সুষ্ঠু ইন্তেযামের লক্ষ্যে প্রতিটি কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করা। দায়িত্বশীলগণ তিন মাস পরপর নিজ নিজ কাজের অগ্রগতির লিখিত রিপোর্ট পেশ করবেন।

এভাবে কাজ করলে আশা করা যায়, জনগণের প্রতি মাদরাসাওয়ালাদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য তার বেশির ভাগই পালন হবে ইনশাআল্লাহ।

নিবেদক : মুফতী মনসূরুল হক
নায়েবে আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক , বাংলাদেশ

পীরে কামেল, শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এর

'মুজাযীনে বাইআত' এর তালিকা

[ইজাযতপ্রাপ্তির ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১. মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব, মুহতামিম, জামি'আতুল আবরার, ঘিওর, মানিকগঞ্জ, মোবা: ০১৭২০৯১৯১২৮।

২. মাওলানা জহুরুল হক সাহেব, মুহতামিম, জামি'আ আরাবিয়া, পুড্ডা, ফরিদপুর, মোবা: ০১৭১৮০৪১২৮৮।

৩. মুফতী হাসান সিদ্দীকুর রহমান সাহেব, মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা, মোবা: ০১৭১২৮১৮৩৪৮।

৪. মুফতী রিজওয়ানুর রহমান সাহেব, মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৮৪০০৯১৮।

৫. মাওলানা মুফীজুল ইসলাম সাহেব, মুহাদ্দিস, জামি'আতুস সুন্নাহ, শিবচর, মাদারীপুর, মোবা: ০১৮৬০৭৬৫২১৩।

৬. মুফতী হেদায়াতুল্লাহ সাহেব, মুহাদ্দিস, জামি'আতুস সুন্নাহ, শিবচর, মাদারীপুর, মোবা: ০১৭৩৩২৬৮৫৮৩।

৭. মুফতী মুশাররফ হুসাইন সাহেব, মুহতামিম, কাসিমিয়া দারুল উলূম, সারদাগঞ্জ, কাশিমপুর, গাজীপুর, মোবা: ০১৯১৭০৩৮৩২১।

৮. মুফতী মুসলিহুদ্দীন রুমী সাহেব, নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলূম, ঢাকা, মোবা: ০১৬৭১৬৪৫৫০৬।

৯. মুফতী আখতারুজ্জামান সাহেব, মুহাদ্দিস, জামি'আ কুরআনিয়া, বকচর, যশোর, মোবা: ০১৯১৭২৯৩৭৯৬।

১০. মুফতী শফীকুর রহমান সাহেব, মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা, মোবা: ০১৮১২৪৬৪৩৬২।

১১. মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব, নায়েবে মুহতামিম, জামি'আতুস সুন্নাহ, ঘিওর, মানিকগঞ্জ, মোবা: ০১৬৮৭৬৪৩৯৬১।

১২. মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ সাহেব, ইমাম ও খতীব, ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ, টাঙ্গাইল, মোবা: ০১৭১১০৩৪৬২৯।

১৩. মুফতী সিদ্দীকুর রহমান সাহেব, নাযেমে দারুল ইকামা, জামি'আ মাহমূদিয়া, দেশীপাড়া, গাজীপুর মহানগর, মোবা: ০১৯৩২৯৮৫৮৩২।

১৪. মুফতী সাঈদুর রহমান সাহেব, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম ঢাকা, মক্কীনগর, বান্দাখোলা, কালিগঞ্জ, গাজীপুর, মোবা: ০১৬১৩২২২৩২৭।

১৫. মুফতী আবুল বাশার সাহেব, মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মৃধাবাড়ী, দেওভোগ, মুন্সীগঞ্জ, মোবা: ০১৯২১২২৬৭৮৭।

১৬. মুফতী তাফাজ্জুল হুসাইন সাহেব, নায়েবে মুহতামিম ও শিক্ষাসচিব, আলজামি'আ মাদীনাতুল উলূম, সিকদার মেডিক্যাল, রায়ের বাজার, ঢাকা, মোবা: ০১৭১২৪৬২৭৪৬।

১৭. মুফতী জহীরুল ইসলাম সাহেব, সিনিয়র মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফতী, জামি'আ ইসলামিয়া বাইতুন নূর, সায়েদাবাদ, ঢাকা, মোবা: ০১৯১৮৬৫৯২৫৬।

১৮. মুফতী রাশেদ ইকবাল সাহেব, মুদাররিস, জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, বৌবাজার, হাজারীবাগ, ঢাকা, মোবা: ০১৯২৩১৩৬৮২০।

১৯. মুফতী নূর মুহাম্মাদ সাহেব, প্রধান মুফতী, উমর ইবনে খাত্তাব রা. মাদরাসা, খাস সাতবাড়িয়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, মোবা: ০১৭১৯৫৩৯৪৫৬।

২০. মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব, নায়েবে মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৮০৭০৩৪৩।

আমি এসব উলামায়ে কেরামের যাহেরী অবস্থার উপর আস্থা করে ইজাযত দিয়েছি। তাদের কারো সঙ্গে কেউ ইসলাহী সম্পর্ক করতে চাইলে, তারা সুন্নাতের উপর কায়েম আছেন কিনা দেখে নিবেন।

মনসূরুল হক
১৫ই রবিউস সানী ১৪৩৮হি.

আঁধার রাতের শেষ প্রহর...

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত ঈসা আ. এর পর দীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বছরকাল মানবজাতির হেদায়াত আর সৎপথ প্রদর্শনের নিমিত্তে কোনো নবীর আগমন ঘটেনি। ফলে হেদায়াতের নূর বঞ্চিত মানব কাফেলা এগিয়ে চলছিলো প্রবৃত্তির তাড়নায়। ঈমান-ইয়াকীন থেকে কয়েক যুগ আগেই সে বঞ্চিত হয়েছিলো। বনী আদমের জনপদ যেন ছিলো হিংস্র জীব-জন্তুর অভয়ারণ্য। এমনই এক মুহূর্তে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে উদিত হলো আখেরী নবীর নবুওয়াত রবি! যেন মানবতার হিম শীতল দেহে উষ্ণ খুনের এক তরঙ্গ বয়ে গেলো। গভীর রাতের অমানিশা বিদূরিত হলো শুভ্র প্রভাতের উজ্জ্বল আভায়...!

بہار اب جو دنیا آئی ہوئی ہے
وہ سب پودا انہی کی لگائی ہوئی ہے

বাগিচায় আজ শত ফুল-কলি,
পাখির কণ্ঠে গান,
আর কারো নয়, কেবলই তাঁহার–
তাঁহারই এ অবদান।

ফুলে-ফলে সুশোভিত শেষ নবীর হেদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শনের এ বিপ্লবী ইহসান এবং তার স্বার্থকতার ইতিহাস অনুধাবনের পূর্বে নবীজীর আগমনকালে সমকালীন বিশ্বের ধর্মীয় ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে অবগতি আবশ্যক।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে সমকালীন বিশ্ব ও ধর্মীয় অবস্থা

ইয়াহুদী ধর্ম

ইয়াহুদী বা বনী ইসরাইল মূলত নবী ইয়াকুব আ. এর বংশধর। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ইয়াহুদীরা আরব ভূখণ্ডের ইয়াসরিব (মদীনা), তাইমা, তাবুক, ফাদাক প্রভৃতি স্থান ছাড়াও গ্রীক ও রোমান শাসনাধীনে থাকা ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ইয়াহুদী ধর্ম যুগ পরম্পরায় বিকৃতির আশ্রয়ে লালিত হয়ে প্রতিবেশী বিভিন্ন মতবাদের বিশেষত পৌত্তলিকতার স্রোতে হারিয়ে গিয়েছিলো। সত্যাশ্রয়ী ইয়াহুদী ঐতিহাসিকগণও এ সত্যের ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'মূর্তিপূজার ব্যাপারে নবীগণের অসন্তোষ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, পৌত্তলিকতা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিলো। ...তাদের তৈরিকৃত 'তালমূদ'ও ('ধর্মকিতাব মিশনা'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এ বাস্তবতার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মূর্তিপূজায় তাদের এক অদ্ভুত সম্মোহন ছিলো।' (The Jewish Encyclopedia (Funk & Wagnalls Company, New York 1901) Vol. 12, p. 568-569)

খ্রিস্টধর্ম

সমকালীন বিশ্বের পরাশক্তিরূপে বিবেচিত 'রোম সাম্রাজ্যে'র ধর্ম ছিলো 'খ্রিস্টধর্ম'। ইয়াহুদী মুনাফিক সেন্ট পলের ষড়যন্ত্র আর বিকৃতির শিকার হয়ে অনেক আগেই খ্রিস্টধর্মে হযরত ঈসা আ. এর তাওহীদের শিক্ষা এবং প্রকৃত আদর্শ বিলুপ্তির আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। ফলে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে খ্রিস্টধর্মও ভেসে গিয়েছিলো পৌত্তলিকতা আর মূর্তিপূজার স্রোতে। পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদক George Sale বলেন, 'ধর্মজাযকদের পূজা এবং খ্রিস্টের ছবি ও প্রতিমার উপাসনা করার ক্ষেত্রে খ্রিস্টসম্প্রদায় বড় সীমাছাড়া হয়ে পড়েছিলো। এমনকি এ যুগের ক্যাথলিকদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।' (Wherry, Rev. E.M. : A Comprehensive Commentary on the Quran: Comprising Sale's Translation and Preliminary Discourse (London, 1896) Vol. 1, p. 62)

পারসিক ধর্ম

সমকালীন বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তি হিসাবে বিবেচিত 'পারস্য সাম্রাজ্যে'র লোকেরাও জড়িয়ে পড়েছিলো প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তুর ইবাদতে। যার মধ্যে যুগ (কাল), আগুন ও সূর্য দেবতা ছিলো অন্যতম। (The Cambridge Ancient History (Cambridge University Press 1939) Vol. 12,P 119)

ব্রাহ্মণ্যবাদ

একথা ঠিক যে, সমকালীন বিশ্বের সকল ধর্মেই কোনো না কোনোভাবে পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছিলো। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদ এক্ষেত্রে 'উৎকর্ষে'র যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলো, তা সত্যিই বিস্ময়কর! Dr. Gustave Le Bon বলেন, 'পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে হিন্দুজাতি এদিক থেকে ব্যতিক্রম যে, উপাসনার জন্য তদের কোন না কোন বাহ্যিক আকৃতির উপস্থিতি অপরিহার্য। ... হিন্দু ব্রাহ্মণ ও দার্শনিকদের এমন সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে, যা তারা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করেছেন। এমনকি উপাস্য সংখ্যা তিনের মধ্যে রাখার প্রচেষ্টাও পণ্ড হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের শিক্ষা শুনেছে, হয়তো গ্রহণও করেছে। কিন্তু কার্যত এ তিন উপাস্যের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতে ও শক্তিতে তারা কোন না কোন উপাস্যকে দেখতে পেয়েছে।' (تمدن ہند – ص ۴۴۰–۴۴۱)

ঐতিহাসিক L.S.S.O Malley বলেন, 'নিজ হাতে উপাস্য তৈরি এবং উপাস্য পরিবারে বৃহদাংশে ছোট ছোট সদস্য যুক্ত হওয়ার এ ধারা বিস্ময়করভাবে বেড়েই চলছিলো। যার একটি বড় অংশ ছিলো ভারতবর্ষের আদিবাসীদের পূজনীয়! যার সংখ্যা ৩৩ কোটি ছিলো বলে উল্লেখ করা হয় ...!!' (Popular Hinduism: The Religion of the Masses (Cambridge University Press 1935) p. 6-7)

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্ম অনেক আগেই তার প্রাণ-উচ্ছ্বলতা এবং আবেদন হারিয়ে ফেলেছিলো। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদ তাকে এমনভাবে গ্রাস করেছিলো যে, বৌদ্ধধর্ম হয়ে পড়েছিলো মূর্তিপূজা সর্বস্ব। ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত Jawaharlal Nehru বলেন, 'ব্রাহ্মণ্যবাদ গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতাররূপে উপস্থাপন করেছিলো; এমনকি স্বয়ং বৌদ্ধধর্মও এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুগমন করেছিলো। ...উপাসনা ব্যবস্থায় জাদু ও কুসংস্কারের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো। ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ একহাজার বছর পর্যন্ত উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করার পর একসময় বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি ও সংকোচন শুরু হয় ... ।' (The Discovery of India (Oxford University Press, 6th edition, 1994) p. 179 – 180)

আরব জাহেলী ধর্ম

প্রাচীন আরবসমাজ ছিল হযরত ইবরাহীম আ. এর সত্য ও তাওহীদী ধর্মের অনুসারী। কিন্তু দীর্ঘ সময়কাল নবী আগমনের ধারা বন্ধ থাকায় প্রবঞ্চিত প্রবৃত্তির তাড়নায় আর অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণায় তারাও হারিয়ে গিয়েছিলো অধঃপতনের নিকষ আঁধারে! ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহর কন্যা জ্ঞান করতো। জিনদেরকে আল্লাহর আত্মীয় মনে করতো। 'বালকা' অঞ্চল থেকে মূর্তিপূজার আমদানী করেছিলো আমর ইবনে লুহাই নামক একব্যক্তি। তার অনুসরণে একপর্যায়ে আরবরা (আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার

করলেও) সৃষ্টি ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে শিরকী আকীদা পোষণ করতঃ হাজারো প্রতিমার পূজায় লিপ্ত হয়েছিলো। প্রত্যেকটি শহর, প্রতিটি গোত্র এমনকি প্রতিটি ঘরের জন্য পৃথক পৃথক পূজনীয় মূর্তি ছিলো। কা'বার অভ্যন্তরে মূর্তি থাকার পাশাপাশি তার আশেপাশে সর্বমোট তিনশত ষাটটি মূর্তি রাখা ছিলো। (সূরা নযম- ২৭, সূরা সফ্ফাত- ১৫৮, সূরা লুকমান- ২৫, সূরা যুমার- ৩, সহীহ্ মুসলিম; হা.নং ১৭৮১, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪১৫৬, মু'জামুল বুলদান লিল-হামায়ী ৫/২৩৬, কিতাবুল আসনাম লিল-কালবী; পৃষ্ঠা ৩৩)

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের সমকালীন বিশ্বচিত্রে ধর্মের যে ছবি ফুটে ওঠে, তা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত সকল ধর্ম এবং মানবরচিত সব মতবাদই এ সময়ে তার মূল প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৌত্তলিকতার স্রোতে হারিয়ে গিয়েছিলো। এ কারণেই ঐতিহাসিক C.V.Vaidya বলেন, 'আটলান্টিক মহাসাগর থেকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী মূর্তিপূজার গাঢ় তমসায় ছেয়ে গিয়েছিলো। খ্রিস্টধর্ম, ইয়াহুদীধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিমার সম্মান প্রদর্শন ও পবিত্রতা রক্ষায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলো।...' (History of Medieval Hindu India (The Oriental Book Supplying Agency, Poona 1921) p. 101)

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান

প্রাচীন গ্রীসে নারী যাবতীয় অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিলো। রাস্তা হতে দূরবর্তী সীমিত জানালা বিশিষ্ট ঘরে পাহারা বসিয়ে নারীকে রাখা হতো। মিসরীয় সভ্যতায় নারীকে পাপের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করা হতো এবং তাদের থেকে দূরত্বকে উত্তম মনে করা হতো। মধ্যযুগের এ প্রবণতার ফলেই Macon এর সভায় এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নারী কি প্রাণহীন দেহ না কি প্রাণযুক্ত!

বৌদ্ধধর্ম মতে পানির ভেতর মাছের অবাধগম্য প্রকৃতির মতো নারীর স্বভাবও। তার কাছে চোরদের মত বিভিন্ন ফাঁদ রয়েছে এবং তার কাছে সত্যের গমন দুর্লভ।

ভারতবর্ষে 'মনু'র ধর্মমতে স্বামী থেকে স্ত্রীর পৃথক জীবনকে অস্বীকার করা হতো। ফলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর মৃত্যুর দিন একই চিতায় সহমরণ প্রথা বাধ্যতামূলক ছিলো।

আর আরব জাহেলী সমাজে নারী উত্তরাধিকারসূত্রে কোনো সম্পদ পেতো না। বিবাহের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিলো না। দুই সহোদরাকে একই সাথে বৈবাহিক বন্ধনে রাখা দোষণীয় গণ্য করা হতো না। পিতার মৃত্যুর পর বড় সন্তান তার মা ব্যতীত পিতার অন্য সকল স্ত্রীকে নিজের বৈধ স্ত্রী মনে করতো। নারীদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিলো যে, কন্যা সন্তান প্রসব হলে তাকে জীবিত মাটির নিচে দাফন করে দেয়া হতো...! (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা নিসা- ৩, ৭, ১৯, ২২, সূরা তাকবীর- ৯, আল-মারআতু ফিল-কুরআন লিল-উসতায আব্বাস মাহমূদ; পৃষ্ঠা ৫১-৫৭, Encyclopedia of Religion and Ethics (T & T Clark, Edinburgh 1912) Vol. 5, p. 271)

সমকালীন বিশ্ব : নৈতিকতা, সামাজিকতা ও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে ছিলো দু'টি পরাশক্তি, পারস্য সাম্রাজ্য ও রোম সাম্রাজ্য। এর পাশাপাশি ধর্মীয় ও ভৌগলিক দিক বিবেচনায় ভারতবর্ষের অবস্থানও উল্লেখ করার ছিলো।

রোমান সাম্রাজ্য

ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ

ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকায় শাসন প্রতিষ্ঠাকারী পরাশক্তি রোম সাম্রাজ্যে সামাজিক অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলার উৎকটতম প্রকাশ ঘটেছিলো রোমান ও মিশরীয় খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গৃহযুদ্ধে। ঐতিহাসিক A.J. Butler বলেন, ঐ দু'টি শতাব্দী ছিলো মিশরীয় ও রোমানদের মধ্যে লাগাতার রক্তক্ষয়ী সজ্ঘাত-সজ্ঘর্ষের যুগ, যার ইন্ধন ছিলো জাতিগত ভিন্নতা এবং ধর্মীয় বিরোধ। তবে দ্বিতীয়টিই ছিলো প্রবলতর। কেননা সে যুগের সর্বরোগের মূলই ছিলো রাজবাদ ও মানুবাদের হিংস্রতা। ... তারা (মিশরীয় মানুবাদীরা) এমন পাশবিক উন্মত্ততা ও জিঘাংসার পরিচয় দিয়েছিলো যা আমাদের পক্ষে আজ কল্পনা করাও সম্ভব নয়। পবিত্র ইনজীলে বিশ্বাসীরা দূরে থাক, ন্যূনতম বিবেকের অধিকারী কোন সম্প্রদায়ও কীভাবে পাশবিকতার এমন স্তরে নামতে পারে তা ভেবে পাই না। (Arab's Conquest of Egypt and The Last Thirty Years of the Roman Dominion (Oxford University Press 1902) p. 29)

সামাজিক অস্থিরতা

রোমান সাম্রাজ্যে মানবজীবনে সামাজিক অস্থিরতা এবং মূল্যহীনতা ছিলো চরম পর্যায়ে। রোমান সম্রাটগণকে প্রভু মনে করা হতো এবং তাদের উপাধি ছিলো August বা মহাত্মন! মিশরের বাদশা ফেরআউনদের ব্যাপারে ধারণা করা হতো যে, তারা সূর্যদেবতা 'রে' এর অবতার এবং প্রতীক! (অধ্যাপক Arthur Christens কৃত আহদে সাসানী মে ইরান; পৃষ্ঠা ৬৪)

সামাজিক অস্থিরতার চিত্র এতটা করুণ ছিলো যে, হাজারো মানুষের জীবন নির্ভরশীল ছিল স্বৈরাচারী বাদশাহর স্বেচ্ছাচারিতার উপর। এ জলোচ্ছ্বাসের শুরু হয়েছিলো হযরত ঈসা আ. এর আগমনের পূর্ব থেকেই। মহামতি Alwxander The Gret (মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দ) জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় উদিত হন এবং ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের শত শত বছরের পুরনো সভ্যতা ধুলোয় মিশিয়ে দেন। সম্রাট Julius Caesar (মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ অব্দ) এবং Hannibal (মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ১৮৩/১৮১ অব্দ) বিজিত জনপদসমূহে এমনভাবে নির্বিচারে মানবহত্যায় লিপ্ত হয়, যেভাবে নিষ্ঠুর শিকারী বন্য প্রাণীদের শিকার করে থাকে। রোম যখন শত্রু বাহিনীর আগুনে জ্বলছিল জনগণের রক্ষাকর্তা সম্রাট Nero (মৃত্যু ৬৮ খ্রিস্টাব্দ) তখন বাঁশি বাজিয়ে পাশবিক উন্মত্ততার একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। (Langer, William L. : An Encyclopedia of World History (1948, Houghton Mifflin Company, Kingsport, Tenn.) p. 34, 64, 96-98, 106)

শোষণ ও নিপীড়ন

রোমান সাম্রাজ্যে সাধারণ জনগণের উপর একদিকে ছিলো চরম দারিদ্র্য! আর অপরদিকে ছিলো শাসকশ্রেণীর চাপিয়ে দেয়া করের অনৈতিক দায়িত্ব। ফলে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো শ্রেণীবৈষম্যের এক ভয়ঙ্কর চিত্র। ঐতিহাসিক Henry SmithWilliams বলেন, বড় বড় নগর জনপদ যা দেখতে বিরান হয়ে পড়েছিল এবং কখনো আর নিজের হৃত গৌরব আর হারানো জৌলুস ফিরিয়ে আনতে পারেনি সেগুলো এ সাক্ষ্যই দেয় যে, বাইজান্টাইন তখন চরম অবক্ষয় ও অরাজকতার শিকার হয়ে পড়েছিল। এর কারণ ছিল মাত্রারিক্ত কর আর রাজস্ব আরোপ, ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি, কৃষি ও চাষাবাদে অবহেলা এবং পরিণতিতে বসতি ও জনপদ ধীরে ধীরে কমে আসা। (The Historians' History of the World (Morrison & Gibb Limited, Edinburgh 1907) Vol. 7, p. 175)

মানবিকতার স্থলে পাশবিকতা ও নৈরাজ্য

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে রোমান সাম্রাজ্যে অধঃপতন এতটা তলানিতে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, যৌনসম্ভোগের লালসায় মানুষ পারিবারিক বন্ধন থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছিলো। ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি ধ্বসে গিয়ে অন্যায় ও দুষ্কৃতি পেয়েছিলো সামাজিক উৎসাহ।

সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিলো চরম দুর্নীতি আর নৈরাজ্য। পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদক Sale বলেন, ন্যায় ও সুবিচার বাজারের পণ্যের মত বেচা-কেনা হতো। ঘুষ ও দুর্নীতি এবং খেয়ানত ও দুষ্কৃতি পেয়েছিলো সামাজিক উৎসাহ। (Wherry, Rev. E.M. : A Comprehensive Commentary on the Quran: Comprising Sale's Translation and Preliminary Discourse (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.,Ltd., London 1896) Vol. 1, p. 62)

রোম সাম্রাজ্যের এই জাতীয় অধঃপতনের কথা আরো স্পষ্ট করে ঐতিহাসিক Robert Briffault বলেন, পঞ্চম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ছিলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং ক্রমশ তা ঘোর থেকে ঘোরতর হয়ে চলছিলো। সে যুগের পাশবিকতা ও বর্বরতা ছিলো আদি যুগের চেয়ে অনেক ভয়াবহ। যেন পচন ধরা সভ্যতার লাশ পচেই চলেছে। যা কিছু ভালো সব মুছে যাচ্ছে এবং ধ্বংস ও বিলুপ্তি অবধারিত হয়ে পড়েছে। যে সকল সমৃদ্ধ জনপদে ঐ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো এবং এক সময় চরম উন্নতি লাভ করেছিলো, যেমন ইটালি ও ফ্রান্স, সেগুলো তখন হয়ে পড়েছিলো গোলযোগ, নৈরাজ্য ও বরবাদির শিকার। (The Making of Humanity (George Allen & Unwin Ltd., London, 1919) p. 164)

পারস্য সাম্রাজ্য

তৎকালীন সময়ে পারস্য সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ছিলো পূর্ব দিকে বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত 'কাবুল' এবং 'বলখ' পর্যন্ত, উত্তরে আযারবাইজন' ও 'আর্মেনিয়া' পর্যন্ত, পশ্চিমে বর্তমান ইরাক ও সিরিয়ার মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া 'ফুরাত' নদী এবং দক্ষিণে 'মাকরান' ও 'পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূখণ্ডের এ অংশকে মনে করা হতো পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। কিন্তু এ অঞ্চলেই সভ্যতার নামে অসভ্যতা, মানবতার নামে পশুত্ব, শাসনের নামে শোষণ ও নিপীড়নের যে স্রোতধারা বয়ে চলছিলো, তার প্রবাহ রুখে দেয়ার মত কোনো আবেদন, আন্দোলন কিংবা নৈতিক কোনো বিচার-বিশ্লেষণ সেখানে ছিলো না। (মু'জামুল বুলদান লিল-হামুবী ৪/২৫৭)

ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের শুরুভাগে পারস্য সম্রাট 'সাবুর ইবনে আরদাশীর' এর শামনামলে অগ্নিপূজা ও খ্রিস্টবাদের সমন্বয় সাধনের সংকল্পে 'মানি' নামক এক সংস্কারবাদীর আগমন ঘটে। যে হযরত মূসা আ. এর নবুওয়াতকে স্বীকার করতো না। তার আন্দোলন ছিলো সমাজের অবাধ যৌন অনাচারের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃতিক ও স্বভাববিরুদ্ধ এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া। মানবজাতির আশু বংশ বিলুপ্তির মাধ্যমে আলো যেন অন্ধকারের উপর বিজয়ী হয়- এজন্য সে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলো। কিন্তু তার এ আন্দোলন মানবজাতির স্বভাববিরুদ্ধ হওয়ায় সম্রাট বাহরাম ইবনে হুরমুয (প্রথম বাহরাম) নিজ শাসনামলে তাকে হত্যা করেন। (তারীখুত তবারী ১/৩৯৮, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১/২৯০)

এর কিছুদিন পর খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শুরুভাগে সম্রাট 'কুবায' এর শাসনামলে আগমন ঘটে 'মাযদাক' নামক অপর এক সংস্কারবাদীর, যে আগুন, পানি ও ঘাসের মত নারী ও সম্পদের ক্ষেত্রেও সমমালিকানার ঘোষণা দেন। এ আন্দোলনের ফলে বিকৃতরুচির লোকেরা সুযোগ লুফে নিলো। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমাজের পিতৃপরিচয় এবং সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্ত হয়ে গেলো। সম্রাট 'আনুশিরওয়া' তাকে হত্যা করেন। (তারীখুত তবারী ১/৪২২, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১/২৯৪, আল-ফিহরিস্ত লিইবনিন নাদীম; পৃষ্ঠা ৫২৮)

সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য

সভ্যতার(?) প্রাণকেন্দ্ররূপে বিবেচিত পারস্য সমাজে শ্রেণীবৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছিলো। কিসরা উপাধিধারী পারস্যের সম্রাটগণ ভাবতেন যে, তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। তাদের ধমনিতে ঈশ্বরের রক্ত প্রবাহিত। পারস্য সম্রাট 'আবরাওয়েয'(পারভেয) এর ব্যাপারে মনে করা হতো সে অদ্বিতীয় প্রভু। (তারীখুত তবারী ১/৪৬৪)

অধ্যাপক Arthur Christensen বলেন, পারস্য সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিলো বংশ ও পেশাগত পরিচয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে ছিলো অনতিক্রম্য ব্যবধান। উপর থেকে নিচে কিংবা নিচে থেকে উপরে যাওয়ার যেমন কোনো যোগসূত্র ছিলো না, তেমনি ছিলো না উভয় শ্রেণীর মাঝে দাস প্রভু ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক। (আহদে সাসানী মে ইরান; পৃষ্ঠা ৫৯০)

পারস্য সাম্রাজ্যে একদিকে সাধারণ জনগণের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের বিভীষিকাময় চিত্র। অপরদিকে ছিলো রাজা বাদশাহদের সীমাতিরিক্ত ভোগবিলাসের পাশবিক উন্মত্ততা, ভয়াল নৃত্য! এ যেন দারিদ্র্যের সাথে বিলাসিতার নিষ্ঠুর উপহাস! কৃষকশ্রেণীকে যুদ্ধের সময় বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হতো। উপরন্তু শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত কর, ভূমি কর প্রভৃতি নামে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো নিত্য নতুন সাধ্যাতীত করের বোঝা। যে করের মাধ্যমে গরীব-অসহায় হতো নিঃস্ব ও সম্বলহীন। পক্ষান্তরে শাসকশ্রেণীর জন্য তৈরি হতো বিলাসিতা ও ভোগের আশ্চর্য সব উপকরণ! (The Cambridge Ancient History (Cambridge University Press 1939) Vol. 12, p. 117)

পারস্য সম্রাটের সান্ধ্যকালীন বিনোদনের জন্য তৈরি হয়েছিলো 'বাহারে কিসরা' নামক ষাট বর্গগজের শাহী গালিচা। মুসলমানরা যাকে 'কিতফ' নামে আখ্যায়িত করতো। এ গালিচায় স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম এবং বিভিন্ন মূল্যবান পাথরের সমন্বয়ে অতি সূক্ষ্ম ও বিস্ময়করভাবে রাস্তা, প্রাসাদ, নদীনালা, গাছপালা ইত্যাদির চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছিলো! সম্রাটদের বিলাসিতার আন্দায এ ঘটনা থেকে করা যায় যে, হযরত উমর ফারূক রাযি. এর খেলাফতকালে সাসানী সাম্রাজ্যের পতনকালে শেষ পারস্য সম্রাট 'ইয়াযদাযিরদ' যখন পালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তার সাথে একহাজার পাঁচক, একহাজার গায়ক, শিকারী বাজপাখী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একহাজার গোলাম, ছিল! এতদসত্ত্বেও সে মনে করছিলো যে, তার এ রিক্ত অবস্থার উপর বেদনার কাব্য আবৃতি করা দরকার...!! (তারীখুত তবারী ২/৪৬৬-৪৬৭, আহদে সাসানী মে ইরান; পৃষ্ঠা ৬৮১)

নৈতিক অবক্ষয়

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে পারস্য সমাজ নৈতিকভাবে এতটাই অধঃপতনের স্বীকার হয়ে পড়েছিলো যে, আপন বোনকে বিবাহ করাও তাদের নিকট কোনো দোষণীয় বিষয় ছিলো না। পারস্য সম্রাট বাহরাম স্বয়ং তার বোন 'কুরদিয়া'কে বিবাহ করেছিলো। (তারীখুত তবারী ১/৪৬৫)

ভারতবর্ষ

ধর্মে যখন নৈতিক অবক্ষয়ের দীক্ষা!

প্রাচীনকাল থেকেই যৌনতা ও কামকেলি ছিলো ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক Gustave Le Bon বলেন, প্রতিমা ও প্রতীক এবং মূর্তি ও স্থূল আকৃতির প্রতি হিন্দুদের অনুরাগ সীমাহীন। ...তাদের মন্দির ও পূজাঘর অসংখ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ। সেগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য হলো লিঙ্গ ও যোনি...!! (তামাদ্দুনে হিন্দ; পৃষ্ঠা ৪৪১)

শ্রেণীভেদ ও বর্ণবৈষম্য

বর্ণবৈষম্য ও শ্রেণীভেদ তৎকালীন সময়ে সমগ্র পৃথিবীর নিত্য চিত্র হলেও ভারতবর্ষে এর পেছনে ছিলো ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এর সামাজিক বৈষম্য ভারতবর্ষকে

অন্যায়, অনাচার ও শোষণের প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত করেছিলো। অনতিক্রম্য এ শ্রেণীব্যবধান ঘুচিয়ে মানুষ হিসেবে ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তিটুকুও সে সমাজে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডণীয় অপরাধ বিবেচিত হত। (Renou, Louis (France, 1966): The Nature of Hinduism (1962, Walker and Company, New York) p. 104)

আরব জাহেলী সমাজ

নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা : হযরত ইবরাহীম আ. এর তাওহীদের স্বচ্ছ নির্মল আসমানী ধর্মের প্রবাহ আরব ভূখণ্ডে অনেক আগেই থেমে গিয়েছিলো। মূর্তিপূজা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, যিনা-ব্যভিচার, মদপানসহ সামাজিক অবক্ষয়ের এমন স্তরে এ সমাজ পৌঁছে গিয়েছিলো যে, সংস্কারের লক্ষ্যে যে ব্যক্তিই অগ্রসর হয়েছে, সেই এ বলে ফিরে এসেছে যে,

تیرے دل میں بہت کام رفو کا نکلا

'শতছিন্ন এ বস্ত্রখণ্ড তালি জুড়বারও নয়।'

কুসংস্কারচ্ছন্নতা : জাহেলী যুগে আরবদের ধারণা ছিলো যে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা 'হুমা' পাখির সুরতে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে থাকে।

যে কোন কাজ করার আগে ফাল বা লক্ষণ বের করার প্রচলন ছিলো। যেমন সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে পাখি উড়িয়ে দিতো। পাখি ডান দিকে উড়ে গেলে ভালো লক্ষণ মনে করে সফরে বেরতো। আর বাম দিকে গেলে কুলক্ষণ মনে করে সফর হতে বিরত থাকতো। (ফাতহুল বারী; হা.নং ৫৭৫৭)

যুদ্ধবিগ্রহ : তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে যাওয়া আরব্য জাহেলী সমাজের নিত্য চিত্র ছিলো, যা বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ চলতে থাকতো। ইতিহাসে এ লড়াইগুলোকে 'আইয়্যামে আরব' নামে আখ্যায়িত করা হয়। যার সংখ্যা সহস্রাধিক। আল্লামা মাইদানী রহ. তার গ্রন্থ 'কিতাবুল আমসাল'-এ ৩২ টি লড়াইয়ের আলোচনা উপস্থাপন পূর্বক 'সকল লড়াইয়ের বিবরণ তুলে ধরতে গণনাশাস্ত্র অক্ষম' বলে মত প্রকাশ করেছেন!

মদপান : মদপান– যা অসংখ্য গোনাহের উৎস– আরবে তার এমন প্রচলন ছিলো যে, তা পান করা সভ্যতা বিবেচিত হতো এবং প্রত্যেকটি ঘর একেকটি পানশালায় পরিণত হয়েছিলো। মদপানকে কেন্দ্র করে রচিত হতো কাব্য–সাহিত্যের অসংখ্য মজলিস! আরবে মদপানের আধিক্যের অনুমান করা যায় ঐ ঘটনা থেকে, যখন মদ হারাম হয়ে গেলো এবং সাহাবায়ে কেরাম তা পালানার্থে নিজ নিজ ঘরে থাকা মদের মটকা ভেঙে ফেললেন, তখন فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ অর্থাৎ মদীনার অলি গলিতে মদের দরুন যেন নদীর প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে গেলো!! (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৪৬৪)

জুয়া : মদপানের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ ছিলো জুয়া। জুয়ার মজলিসে তারা উট জবাই করে নির্ধারিত দশটি তীর– যার সাতটিতে গোশতের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ থাকলেও তিনটিতে কোনো সংখ্যা ছিলো না– উটের দশ মালিক উত্তোলন করতো এবং তীরে উল্লিখিত পরিমাণ হিসেবে কেউ পেতো আর কেউ বঞ্চিত হতো। এ জুয়ার মজলিস এতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলো যে, যে তাতে অংশগ্রহণ করতো না, তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক দোষণীয় জ্ঞান করা হতো! (তাফসীরে কাবীর লির-রাযী; সূরা মায়িদা- ৩)

সুদগ্রহণ : আরব্য জাহিলী সমাজের ধনাঢ্য শ্রেণীর মাঝে ব্যাপকভাবে সুদ গ্রহণের প্রচলন ছিলে। এমনকি ঋণ প্রদানের পর নির্দিষ্ট মেয়াদে তা আদায় না করার ক্ষেত্রে ঋণদাতা কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধিপূর্বক মূলধনেও কয়েকগুণ বৃদ্ধি ঘটিয়ে সুদ আদায়ের অভিনব পন্থার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। ফলে সমাজের গরীব শ্রেণী ক্রমেই অর্থনৈতিক শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে ধুঁকছিলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা বাকারা- ২৭৮, সূরা আলে ইমরান- ১৩০)

চুরি, ডাকাতি ও রাহজানি : ডাকাতি ও রাহজানি আরব্য সমাজের এমন ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিলো যে, এক গোত্র আরেক গোত্রের লোকদের ধন সম্পদ, গবাদি পশু এমনকি স্ত্রী-সন্তান পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গিয়ে ভোগ করতো কিংবা বিক্রি করে দিতো এবং এ গর্হিত কাজকে 'বীরত্ব' আখ্যা দিয়ে কাব্য সাহিত্যে তার স্মৃতি ধরে রাখতেও তারা পারঙ্গম ছিলো। কোনো কোনো গোত্র (যেমন 'তায়') তো دُعَّارٌ (লম্পট, বখাটে) গোত্র হিসেবে এতটাই হিংস্ররূপ ধারণ করেছিলো যে, তাদের প্রতিবিধান কোনো অলৌকিক শক্তির পক্ষেই কেবল সম্ভব ছিলো। এ কারণেই ইসলামের আগমনের পরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'সুদূর ইরানের হিরা নগরী হতে একা একটি নারীর নিরাপদে মক্কা সফরের' ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন তায় গোত্রের সরদার আদী ইবনে হাতেম রাযি. আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তখন তায় গোত্রের লম্পটেরা কি থাকবে না? (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৫৯৫)

পশুত্ব ও নির্মম পাশবিকতা : আরবের জাহেল লোকেরা পাশবিকতার এমন নির্মম স্তরে পৌঁছেছিলো যে, তা কোনো সুস্থ বিবেক কল্পনাও করতে পারে না। লড়াইয়ের ময়দানে গর্ভবতী নারীর পেট ফেড়ে ফেলা হতো। নিহতদের নাক কান কেটে মহিলাদের অলঙ্কার তৈরী করা হতো এবং খুলি দিয়ে মদ পানের পাত্র তৈরি করা হতো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৮১৬, ২৮০৫, সুলাইমান নদবী ও শিবলী নোমানী কৃত সীরাতুন্নবী ৪/৬১৭)

নির্লজ্জতা এবং ব্যভিচার : ব্যভিচার এবং নির্লজ্জতার সয়লাব এতটা প্রকট ছিলো যে, ব্যভিচারিণী নারী খদ্দেরের আশায় নিশানা স্বরূপ নিজ ঘরের সামনে পতাকা টানিয়ে রাখতো। একজন স্বামী ভালো সন্তান লাভের আশায় নিজ স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার নিমিত্তে অন্য কোনো বীর পুরুষের সঙ্গিনী হওয়ার জন্য নিজেই পাঠিয়ে দিতো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১২৭)

অজ্ঞতা : অজ্ঞতা ছিলো আরব সমাজের মারণব্যাধি। আসমানী ধর্মের নির্মল আকীদা-বিশ্বাস থেকে অজ্ঞতা তো ছিলই, পাশাপাশি সুস্থ রুচিবোধ থেকেও অজ্ঞতা মহামারির আকার ধারণ করেছিলো। ফলে রক্ত, মৃত জন্তু, শুকর, যমীনের বিভিন্ন কীটপতঙ্গ তদের প্রিয় খাদ্য হিসেবে বিবেচিত ছিলো। (তাফসীরে তবারী; সূরা মায়িদা-৩)

এই ছিলো খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে পৃথিবীর ভয়াল চিত্র! যা ছিলো মূলত পচে যাওয়া একটি দেহ, যার কোনো অঙ্গেই প্রাণস্পন্দন ছিলো না। মানবতার বৃক্ষে এমন একটি সবুজ পাতাও তখন অবশিষ্ট ছিলো না, যা ক্লান্ত মুসাফিরের হৃদয়ে প্রশান্তির মৃদু ছোঁয়া বুলিয়ে দিতে পারে...! অধ্যাপক H. GWells তাই বলেন, পশ্চিম ইউরোপে এ সময় ন্যায়-নীতি, শৃঙ্খলা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট ছিলো না। একদিকে বাইজান্টাইন ও ইরানী সাম্রাজ্য ছিলো ধ্বংস ও বিনাশের লড়াইয়ের শিকার। অপরদিকে ভারতবর্ষ পিষ্ট হচ্ছিলো দুঃখ, দুর্দশা আর বর্ণবৈষম্যের যাঁতাকলে। (Wells, H.G.: A Short History of the World (Macmillan, New York 1922) p. 248)

শান্তির সুবাতাস

এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ই আগমন ঘটেছিলো আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তাঁর আগমন ঘটেছিলো সর্বাধিক অধঃপতিত আরব ভূখণ্ডে। কেননা, এতটা অধঃপতনের পরও আরব জাতির মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো, ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্বদরবারে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যার অপরিহার্যতা ছিলো অনস্বীকার্য। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহান এবং প্রজ্ঞাময়!

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

পা নি ন য় ! ম রী চি কা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... **অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের** কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-১৫

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিন এক ছোট ভাই তার স্ত্রীর পড়াশোনার ব্যাপারে পরামর্শ চাচ্ছিল। বলল, স্ত্রী কলেজে পড়ে। খুবই মেধাবী। তার ক্লাসে বৃত্তি পাওয়া একমাত্র ছাত্রী। কলেজে কো-এডুকেশন তথা ছাত্র-ছাত্রীর একসঙ্গে ক্লাসের ব্যবস্থা। স্ত্রী যদিও বোরকা-হিজাব পরেই কলেজে যাওয়া-আসা করে, কিন্তু তার কাছে বিষয়টা নিরাপদ মনে হয় না। কাজেই স্ত্রীকে কলেজে পড়াতে তার ইচ্ছা হয় না। এ ব্যাপারে তার ও স্ত্রীর অভিভাবকদের সকলের মত তার মতের বিপরীত। তার বড় ভাইয়ের উক্তি হল, তুই ওর পড়ার খরচ দিতে না পারলে আমি দিব; কিন্তু ওর পড়া বন্ধ করা যাবে না। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর প্রতি ভাসুরের এত স্নেহ– মাথাব্যথার আরেকটি কারণ।

যাই হোক আমি তাকে বললাম, যদি শরীয়তমতে চলতে চান তাহলে স্ত্রীকে সহশিক্ষায় পাঠানোর কোন সুযোগ নেই। পাঁচ-সাত বছর বয়সী শিশু স্ত্রী হলে কথা ছিল। কিন্তু সেয়ানা এবং বালেগা মেয়েদের জেনারেল শিক্ষার জন্য ঘরোয়া পরিবেশের বাইরে যাওয়া, উপরন্তু সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নেয়া শরীয়তসম্মত হওয়ার সুযোগ আমাদের জানামতে নেই। অতীত-বর্তমানের কোন আলেমে দীন শরীয়তসম্মত বলেছেন বলেও আমাদের জানা নেই। কারণ খোদাভীরু কোন আলেম অন্যের গুনাহের দায় নিজের কাঁধে নেয়ার মত বোকামী করেন না।

তাকে আরও বললাম, যে কয়েকটি বিষয় মানুষের অন্তরকে খুব গরম করে তোলে যেমন ক্ষমতা, সম্পদ, শক্তি ইত্যাদি– এসবের গরিমা অনেকেই হজম করতে পারে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষার গরমও অনেক বেশী। পুরুষরা এর গরম হজম করতে পারে; নারীরা অনেকটাই পারে না। এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী মনে পড়ল। কাহিনীটি আমাদের আরেক ছোট ভাই শুনিয়েছিল। তার এক পরিচিতের কাহিনী–

বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরি করছেন। এবার বিবাহের পালা। অনেক দেখাশোনার পর আরেক সরকারি চাকরিজীবি বিসিএস ক্যাডার পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। যথাসাধ্য অনুসন্ধানে ভালো বিবেচিত হওয়ায় বিবাহের কথা চূড়ান্ত হল এবং নির্ধারিত তারিখে বিবাহ সম্পন্ন হল। কনে পক্ষ খুশী, বর পক্ষ একটু বেশিই খুশী। কারণ সহজে এমন সুন্দর জুটি তারা আশা করেনি। মেয়ে তো যাকে বলে 'সেই রকম স্মার্ট!' বিবাহের কয়েকদিন পর হানিমুনের উদ্দেশ্যে দু'জনে ছুটি নিয়ে কক্সবাজার যাওয়ার প্রোগ্রাম তৈরি করল। হানিমুনে গেলে তাদের আনন্দে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না; দু'জনে দু'জনায় কয়েকদিন কাটাবে এই ছিল লক্ষ্য। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে ঘুরছে, সেলফি তুলছে, প্রথম বেলা হাঁটু পানিতে গোসল করছে আর বিকাল বেলা আরাম কেদারায় পা ছড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে এ সকল স্বপ্ন এখন তারা জাগ্রত অবস্থায় দেখা শুরু করেছে।

কাঙ্ক্ষিত দিন এসে গেল। কক্সবাজারের লাক্সারিয়াস বাসে সমুদ্র সৈকতের কাছাকাছি একটি ফাইভস্টার হোটেলে গিয়ে পৌঁছল। হোটেলের রিসিপশনে গিয়ে একটা ডাবল বেডের রুম ভাড়া করল এবং রুমের চাবি হাতে নিয়ে স্ত্রীসহ যেই না রুমের দিকে যাবে এমন সময় তার মুঠোফোনে অজানা নাম্বার থেকে কল আসল। কল রিসিভ করে সে শুধু হ্যাঁ-হ্যাঁ করছিল। এ সময় তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। চলার গতি ধীর হয়ে আসছিল। ফোনে কথা বলা শেষ করে সে থেমে গিয়ে উল্টো রিসিপশনের দিকে হাঁটা দিল। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? রুমে যাবে না? সে জবাব দিল, স্যাড নিউজ (খারাপ খবর)। আমাদেরকে এক্ষুণি ঢাকায় ফিরে যেতে হবে। কী খবর? পরে বলব। তারপর রিসিপশনে চাবি ফেরত দিল এবং স্যাড নিউজের অজুহাত দেখিয়ে বুকিং ক্যান্সেল করে তখনই ঢাকায় রওয়ানা হয়ে গেল। পথিমধ্যে সে স্ত্রীর সঙ্গে হ্যাঁ-না এর চেয়ে বেশি বলা থেকে বিরত থাকল। ঢাকায় পৌঁছে স্ত্রীকে তার পিতার বাসায় উঠিয়ে বলে দিল, আমি বাসায় যাচ্ছি, ফোন দিলে তুমি বাসায় এসো। বাসায় এসে বাবা-মাকে সামনে নিয়ে ফোনের কাহিনী শুনাল–

'আমরা তখন হোটেলরুমের দরজায় পৌঁছে গেছি। এমন সময় ফোনটি আসল। অপর প্রান্ত থেকে একটি পুরুষকণ্ঠ আমাকে জিজ্ঞেস করল,

–আপনি কি অমুক?

–বললাম, হ্যাঁ-হ্যাঁ।

–আপনি কি অমুককে বিয়ে করেছেন?

–হ্যাঁ-হ্যাঁ।

–ভাই! সে কিন্তু আমার স্ত্রী; তার সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের সংসার। ও আর আমি একই সঙ্গে বিসিএস পরীক্ষা দেই। সে পাশ করেছে আর আমি পাশ করতে পারিনি। এ কারণে সে আর আমার সঙ্গে থাকবে না। সে একজন বিসিএস ক্যাডার ছেলে খোঁজ করতে থাকে। তারপর যখন আপনার সঙ্গে বিয়ের কথা চলছে তখন আমি যেন কোনভাবে ঘটনা ফাঁস করতে না পারি সেজন্য ভাড়াটে সন্ত্রাসী দিয়ে আমাকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। আমি হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেয়ে যে কোনভাবে আপনার ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে আপনাকে বিষয়টা অবহিত করলাম। ভাই! আপনি বিষয়টির তদন্ত করুন। আমি আপনাকে সহযোগিতা করবো। আজকের মত রাখি।

একথা বলে সে তার ফোন রেখে দিয়েছিল।'

কাহিনী শুনে বাবা-মার তো চোখ ছানাবড়া! বাবা বললেন, কী বলিস! চিরুনী অভিযান চালিয়ে এত্তো ভালো মেয়ে বিয়ে করালাম; আর এখন শুনি সে আরেকজনের পাঁচ বছর সংসার! ছিঃ ছিঃ কী দুর্ভাগ্য! এদিকে মায়ের দু-চোয়াল যেন জোড়া লেগে এক হয়ে যাচ্ছে। কথা বলা তো দূরের কথা, ঢোক গেলাই

মুশকিল! ছেলে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, বিষয়টা একটু যাচাই করা দরকার। যাচাই কীভাবে করা যায়, এ নিয়েও পরামর্শ হল। সিদ্ধান্ত হল, মেয়ে ও তার বাবা-মা এবং ফোনে স্বামী দাবিদার ছেলেটি ও তার বাবা-মা দু-পক্ষকে মুখোমুখি বসানোর ব্যবস্থা করা হবে। সে অনুযায়ী দিনক্ষণ ঠিক করে উভয় পক্ষকে দাওয়াত দেয়া হল। মেয়ের বাবা-মাকে বলা হল, আমাদের পারিবারিক বিষয়ে একটা জরুরী পরামর্শ আছে। আপনারা দু'জনেই ওকে নিয়ে কাইন্ডলি অমুক দিন অমুক সময় আমাদের বাসায় একটু আসবেন। আর স্বামী দাবিদারকে বলা হল, আপনি আপনার বাবা-মাকে নিয়ে অমুক দিন অমুক সময় আসবেন। বাসার কাছাকাছি এসে ফোন দিবেন। আমরা যখন ঢুকতে বলব, তখনই বাসায় ঢুকবেন, এর আগে নয়।

সময়মত প্রথম পক্ষ হাজির। সাথে হাদিয়া-তোহফা; কত কী! সকলের সাথে কুশল বিনিময় শেষ হলে তাদেরকে ড্রয়িং রুমে বসতে দেয়া হল এবং বলা হল, আমাদের আরো ক'জন মেহমান আসছে; একটু বসুন, কথাবার্তা বলি। ইতোমধ্যে ঐ ছেলেকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করা হল,

–কদ্দূর?

–হ্যাঁ, আমরা বাসার কাছে এসে পড়েছি।

–আচ্ছা! সোজা বাসায় চলে আসুন।

কলিং বেলের আওয়াজ পেয়ে দরজা খোলার পর আগত মেহমানদের চেহারা দেখেই আগের মেহমানগণ চেহারা আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। তারপর যখন তারা সালাম দিয়ে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল, তখন মেযবান বাবা মেয়ের বাবাকে লক্ষ্য করে বললেন, বেয়াই সাব! উনাদেরকে আপনারা চেনেন? কোন জবাব নেই। কারণ সে ছেলে তো সাথে করে বিয়ের অ্যালবাম নিয়ে এসেছে। পরিস্থিতি দেখে নকল জামাই তার নকল শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, সোজা বেরিয়ে যান! বিলম্ব করে পিটুনি খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন না। কেমন বাবা-মা! কেমন মেয়ে! এমন বজ্জাত হতে পড়ালেখা করা লাগে? আরও কিছু কড়া কথার পর অবস্থা বেগতিক দেখে এ ত্রিরত্ন মাথা নিচু করে চটজলদি কেটে পড়ল। অতঃপর প্রকৃত স্বামী ও তার বাবা-মা উপস্থিত মেহমানদারী গ্রহণ করে বিদায় নিল।

এ ঘটনা শুনে আমার সে ছোট ভাই বলল, এখন তো আমার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। আসলে এখনকার সমাজে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। উপযুক্ত ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে পড়ালেখা, নিত্য উঠাবসা বছরের পর চলতে থাকলে কে কাকে, কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করবে? সবাই তো রক্তে-গোশতে মানুষ। কেউ তো আর নূরের তৈরি ফেরেশতা নয়।

প্রিয় পাঠক! মূল ঘটনাটি কোন কল্প-কাহিনী নয়; বর্তমান সমাজের অতি স্বাভাবিক ও বাস্তব একটি নমুনা। এ জাতীয় ঘটনার আলোকে ইসলামী পর্দার বিধানের গুরুত্ব একটু হলেও অনুধাবন করা উচিত।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : আবূ তামীম

বিসমিহী তা'আলা

ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ ও
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া এর সিলেবাস ও মতাদর্শে পরিচালিত-

দারুল ফকীহ্ ইবনে আবেদীন আলইসলামিয়া ঢাকা

বিভাগসমূহ

- **নূরানী বিভাগ**
  (হাটহাজারী নূরানী বোর্ডের অধিনে পরিচালিত)
- **হিফয বিভাগ**
- **ইসলাম শিক্ষা কোর্স**
  (বয়স্ক ও কর্মব্যস্তদের জন্য)
- **ইফতা বিভাগ**
  পর্যায়ক্রমে তাফসীর ও হাদীস বিভাগ

পরিচালক,
মুফতী শামউন সিরাজী
দাওরায়ে হাদীস ও তাখাস্সুস ফিল ইফতা;
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল নং- ০১৭১০-৭৭৬১৩৭

বি.দ্র. ইসলাম শিক্ষা কোর্সে ভর্তি চলছে, ১লা রমাযান থেকে সকল বিভাগে ভর্তি চলবে এবং ১৫-২৫ শে শা'বান ও ১-২০ শে রমাযান উসূলে ফিকহের কোর্স চলবে ইনশাআল্লাহ।

ফিউচার টাউন, বসিলা রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

আলোক মিনার

দ্বীপ ভোলার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা.

মাওলানা যুবাইর মাহমূদ

এক পড়ন্ত বিকেলে আমি আর মাওলানা ইউনুস সাহেব উপস্থিত হই ভোলার খানকায়ে রাহমানিয়া আরাবিয়ায়। হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত রহ. প্রতিষ্ঠিত এ খানকার নাযেম ভোলার প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা.। ৫৯ বছর বয়সী এ প্রবীণ আলেম ফকীহুল মিল্লাত রহ. এর একজন বিশিষ্ট মুজায। আল-মাদরাসাতুল কুরআনিয়া দারুল আইতামের স্বনামধন্য পরিচালক। এছাড়া ভোলা জেলা ইত্তিহাদুল উলামায়িল মাদারিসিল কওমিয়্যার সেক্রেটারীরও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। দীনের ব্যাপক প্রচার-প্রসার, সুলূক ও তরীকতের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা, বাতিল বিরোধী অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনসহ বহুমুখী বর্ণাঢ্য কর্মের মাধ্যমে তিনি এ অঞ্চলের জন্য এক ধ্রুবতারায় পরিণত হয়েছেন।

সদা প্রাণবন্ত এবং অতিথিপরায়ণ মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা. আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিকতায় আপ্লুত হয়ে মুসাফাহা করেন। তার কাছে খানকার প্রতিষ্ঠাকাল এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে খানকায়ে রাহমানিয়া আরাবিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। খানকায় প্রতি মাসে একবার শবগুযারী হয়। এতে উলামায়ে কেরাম উপস্থিত থাকেন। অধিকন্তু প্রত্যেক বছর একটি বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমাও হবে বলে তিনি আমাদের জানান।

ভোলার উলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে সুলূক ও তরীকতের উদ্ভাসিত সাধনায় মনোযোগী হওয়ার প্রত্যক্ষ উসীলা মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা.। তার দাওয়াতী মেজায ও হৃদয়ের অবিশ্রান্ত জ্বলন এক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। প্রতিবছর বসুন্ধরায় অনুষ্ঠিত রবিউল আউয়াল মাসের ইসলাহী মজলিসে ভোলার উলামায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে শরীক হন। এটা মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা. এর আন্তরিক প্রচেষ্টার অনন্য ফসল।

তথাকথিত আহলে হাদীস এবং বিদ'আতীসহ সকল বাতিল বিরোধী আন্দোলনে মাওলানার ভূমিকা চোখে পড়ার মত। কিছুদিন পূর্বে তথাকথিত আহলে হাদীস ও লা-মাযহাবী ফিতনা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ইত্তিহাদের উদ্যোগে মাওলানা একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। বাংলাদেশের শীর্ষ পর্যায়ের আলেমগণ এতে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনটি সফল করার জন্য তার দু'আ, রোনাযারী এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন কমতি ছিল না। তার উদ্যম, দূরদর্শিতা এবং সীমাহীন সাহস উলামায়ে কেরামসহ সকল মুসলমানের অন্তরে অনিরুদ্ধ শক্তি সঞ্চার করে।

ভোলা জেলার উলামায়ে কেরামের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ইত্তিহাদুল উলামায়িল মাদারিসিল কওমিয়া (ভোলা জেলা আঞ্চলিক কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)। মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা. সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ সংগঠনের সার্বিক উন্নতি বেড়েই চলছে। যে সকল মাদরাসা ইতোপূর্বে ইত্তিহাদভুক্ত ছিল না, তারাও এখন এতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আমরা মনে করি এটা তার ইখলাসের প্রতিফলন।

হযরত মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা. সম্পর্কে জানতে চাইলে ভোলার বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুসলিহুদ্দীন ইসলামপুরী বলেন, মাওলানা বশীরুদ্দীন সাহেবের অনেক গুণ আমাকে মুগ্ধ করে। তার সবচে' বড় গুণ হল, দীনের যে কোন কাজে তিনি সর্বদা লাব্বাইক বলেন। এক্ষেত্রে কোন কিছুই তাকে অবদমিত করে রাখতে পারে না। ভোলা জেলা ইত্তিহাদের সভাপতি প্রসিদ্ধ আলেমে দীন মাওলানা আনাস সাহেব বলেন, মাওলানা বশীরুদ্দীন একজন উদ্যমী মানুষ। বর্তমানে এমন কর্মঠ ও উদ্যমী মানুষের বড়ই অভাব। তজুমদ্দীন হুসাইনিয়া মাদরাসার সিনিয়র উস্তাদ বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ইউনুস সাহেব বলেন, হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত রহ. এর বেশ কিছু গুণ মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা. এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে দূরদর্শিতা ও অতিথিপরায়ণতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ পর্যায়ে মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা. এর মজলিস থেকে তার কিছু কথা তুলে ধরছি। তিনি বলেন, একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য একজন শাইখে কামেলের হাতে নিজেকে সোপর্দ করা জরুরী। বিশেষত উলামায়ে কেরামের জন্য তো সুলূক ও তরীকতের মেহনত অপরিহার্য কর্তব্য। হারদুঈ হযরত রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ (যিকির ছুটে গেলে রূহ অনাহারী থাকে)। মাওলানা তার এক বয়ানে বলেন, ধনীদের জন্য তিনটি দু'আ করবে। এক. আল্লাহ তা'আলা তাদের দানকে কবুল করেন। দুই. তাদের মালে বরকত দান করেন। তিন. তাদের এবং তাদের আওলাদকে হেদায়াত দান করেন।

হযরতের সময়স্বল্পতা ও মাদরাসার কাজে ব্যস্ততার কারণে আমরা তার থেকে বেশি উপকৃত হতে পারিনি। এজন্য মনে একটা অতৃপ্ত বাসনা রয়ে গেছে। আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে আমরা আবার হাযির হবো তার মুবারক সান্নিধ্যে– এমন আশাই হৃদয়ে পুষছি।

পরিশেষে বলব, সাম্প্রতিককালে ভোলা অঞ্চলের জন্য মাওলানা বশীরুদ্দীন দা.বা. একটি চেতনাদীপ্ত নাম। যার উদ্যম, আত্মপ্রত্যয় ও কর্মকুশলতা তাকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিকামনা আর দীনের বহুমুখী খিদমত তাকে পৌঁছে দিবে সফলতার স্বর্ণশিখরে। আমরা মহান রবের সমীপে তার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

লেখক : মুদাররিস, মদীনাতুল উলূম হোসাইনিয়া মাদরাসা, তজুমদ্দীন, ভোলা

সুন্নাহ-সম্মত পোশাক-২

মুফতী শাব্বির আহমাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ মূলনীতি : পুরুষের পোশাক জাফরানী, কুসুমী কিংবা গাঢ় লাল রঙের না হওয়া

পুরুষের জন্য জাফরানী রঙের পোশাক না হওয়া, অনুরূপ কুসুমী রঙ কিংবা গাঢ় লাল রঙ না হওয়া। অবশ্য লাল ডোরাকাটা হলে সমস্যা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের জন্য সাদা পোশাক পছন্দ করতেন। ইরশাদ হয়েছে,

البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم.

অর্থ : তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরিধান করো। কেননা, পুরুষের জন্য তা সর্বোত্তম। আর তোমাদের মৃতদেরও সাদা কাপড়ের কাফন পরাও।[১]

সপ্তম মূলনীতি : অহঙ্কার সৃষ্টিকারী এবং প্রসিদ্ধির পোশাক না হওয়া

অহঙ্কার ও লোক দেখানো মানসিকতা সর্বাবস্থায় এবং সকল কাজেই পরিত্যাজ্য। লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে বিধান এর ব্যতিক্রম নয়। মানুষকে দেখানোর জন্য বা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খুব জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক বা ব্যতিক্রমধর্মী পোশাক পরিধান করাও নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامةثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ.

অর্থ : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধির পোশাক পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্চনার পোশাক পরাবেন। অতঃপর তাকে অগ্নিদগ্ধ করা হবে।[২]

অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.

অর্থ : নিজ রুচিমত আহার কর, রুচিমত পরিধান কর তবে দুটি জিনিস থেকে বেঁচে থাক– অপচয় এবং অহঙ্কার।[৩] (সহীহ বুখারী - লেবাস অধ্যায়)

অতএব নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ, অন্যের উপর নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন কিংবা অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্য থাকলে সে পোশাক হারাম।

অষ্টম মূলনীতি : পোশাক পরিষ্কার ও পরিপাটি হওয়া

পোশাকের একটি উদ্দেশ্য সজ্জা গ্রহণ ও সজ্জিত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা পোশাকের জন্য ريشا শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হল সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা। পোশাকের মাধ্যমে মানুষের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, দেহাবয়ব সজ্জিত হয়। দৃষ্টিকটু এবং ঘৃণার উদ্রেক হয় এমন পোশাক শরীয়তের চাহিদা পরিপন্থী। সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ময়লা কাপড় পরিহিত দেখে বললেন,

أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه.

অর্থ : এই ব্যক্তির কাছে কি এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে কাপড় ধৌত করে নিবে।[৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পোশাক পরিপাটি করতে বললেন এবং ইরশাদ করলেন, জেনে রাখো আল্লাহ তা'আলা স্বভাবগত নোংরামী বা ইচ্ছাকৃতভাবে নোংরা থাকা কোনটিই পছন্দ করেন না।[৫]

আমাদের সমাজে কোন কোন মানুষ অপরিচ্ছন্ন থাকাকে দীনদারী মনে করে। রাস্তাঘাটে, মাজার, দরগায় এক শ্রেণীর মানুষকে দেখা যায় যারা অত্যন্ত নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকে। মানুষ এদেরকে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ মনে করে। অথচ বুযুর্গীর সাথে এর দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। এগুলো সবই শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। ইসলাম বহির্ভূত কর্মকাণ্ড। শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্নতা সর্বাবস্থায়ই কাম্য। আর কারো সামর্থ্য থাকলে নিম্নমানের পোশাকও তার জন্য পছন্দযোগ্য নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, একদা এক ব্যক্তি একেবারে নিম্নমানের পোশাক পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসেছিল। লোকটির অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ. قَالَ مِنْ أَىِّ الْمَال. قَالَ قَدْ أَتَانِىَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ.

অর্থ : তোমার কি কোন সম্পদ আছে? সে বললো, হ্যাঁ, আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী সম্পদ আছে? সে বলল, উট, ছাগল, ঘোড়া, গোলাম সব ধরনের সম্পদই আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তোমাকে সম্পদ দান করেছেন তাই এর কিছু আলামত তোমার পোশাকে প্রকাশ পাওয়া উচিত।[৬]

বোঝা গেল, সামর্থ্যের চেয়ে নিম্নমানের পোশাক পরা প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের না-শোকরী করা। তবে অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য উন্নতমানের পোশাক পরিধান করা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ।

কিন্তু অবহেলাজনিত অপরিপাটিতা ও এলোমেলোভাব পরিত্যাগ করে পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, সুন্দর ও আর্থিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যমানের পোশাক পরিধান করা উচিত। তবে পোশাকের গোছগাছ নিয়ে অতিব্যস্তও হবে না।

---

১. মুসনাদে আহমদ; হা.নং ২২১৯, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৮৭৮, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৯৯৪, ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ, এছাড়াও বিভিন্ন শব্দে অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায়।

২. মুসনাদে আহমদ; হা.নং ৫৬৬৪, মুসনাদে আবূ ইয়ালা; হা.নং ৫৬৯৮, সুনানে নাসায়ী ফিল কুবরা; হা.নং ৯৫৬০, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

৩. সহীহ বুখারী, ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. এর এই বক্তব্যটি তা'লীক হিসেবে লিবাস অধ্যায়ের সাথে উল্লেখ করেছেন।

৪. মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৪৮৯৩, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৬২, মুসনাদে আবূ ইয়ালা; হা.নং ২০২৬, আল্লামা মুনাভী রহ. বলেন, قال العراقي : إسناده جيد ২/১৬৬।

৫. সাহ্‌ল ইবনে হানযালিয়্যাহ থেকে বর্ণিত হাদীসটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ-

وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِى النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّشَ.

দেখুন- মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৭৬৬১, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৮৯।

৬. মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৭২৬৮, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৬৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২০০৬, ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৬৫, হাকেম রহ. বলেন, صحيح الإسناد, অর্থাৎ হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী রহ. উক্ত মন্তব্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

নবম মূলনীতি : ছবি বা বিধর্মীয় প্রতীকযুক্ত না হওয়া

ইসলামে সব ধরনের প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা, ব্যবহার করা ও পোশাকে প্রাণীর ছবি বহন করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ সকল কর্মে জড়িতদের সম্পর্কে কঠিন শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। উপরন্তু এগুলো দেখলে ভেঙ্গে ফেলতে বা মুছে ফেলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

قدم رسول الله –صلى الله عليه وسلم– من سفر وقد سترت على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرنى فنزعته.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরে এসে দেখলেন যে, আমি আমার ঘরের দরজায় একটি পর্দা লাগিয়েছি যাতে পঙ্ক্ষিরাজ ঘোড়ার ছবি আঁকা ছিল, তিনি আমাকে তা খুলে ফেলার নির্দেশ দেন, ফলে আমি তা খুলে ফেলি।[৭]

অন্য হাদীসে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে দেখেন যে, আমি ঘরে একটি পর্দা টাঙিয়েছি যাতে ছবি রয়েছে, তা দেখে ক্রোধে তাঁর পবিত্র চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি পর্দাটি হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি ভোগ করবে ঐ সকল মানুষ যারা আল্লাহর সৃজনকর্মের অনুকরণ করে (প্রাণীর ছবি আঁকে)। (সহীহ মুসলিম - ২/২০০)

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, আমাকে আলী রাযি. বলেন, আমি তোমাকে সে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে, কোন উঁচু কবর দেখলে তা সমান করে দেবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে। (সহীহ মুসলিম ১/৩১২)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতে ছবি, ক্রুশ চিহ্ন বা ক্রুশের ছবি সংবলিত কোন কিছু রাখতে দিতেন না, তা খুলে ফেলতেন বা ছবির অংশটুকু কেটে ফেলতেন। (সহীহ বুখারী ২/৮৮০)

বর্তমানে প্রাণীর ছবিযুক্ত গেঞ্জি, টি-শার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রবণতা যুবসমাজের মধ্যে বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, যে কোন প্রাণীর ছবি সংবলিত পোশাক পরিধান করা নাজায়েয। অনুরূপ কোন ধর্মীয় প্রতীক যেমন ক্রুশ ইত্যাদি সংবলিত পোশাক পরিধান করাও নাজায়েয এবং হারাম।

দশম মূলনীতি : বড়দের জন্য নিষিদ্ধ পোশাক শিশুদেরকেও না পরানো

শিশুদেরকে ইসলামী আদব ও মূল্যবোধ শেখানো পিতামাতার দায়িত্ব। ইসলামে যা কিছু নিষিদ্ধ বা হারাম তা থেকে তাদেরকে দূরে রাখা পিতামাতার কর্তব্য। নিষিদ্ধ খাদ্য, পানীয়, পোশাক ইত্যাদি সবধরনের অবৈধ জিনিস থেকে তাদের দূরে রাখা এবং এগুলোর প্রতি আকর্ষণ যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের সমাজে অনেক ধার্মিক পিতা-মাতা তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী পোশাক পরিয়ে থাকেন, যেমন- আঁটসাঁট পোশাক, অমুসলিম মহিলা বা পুরুষদের পোশাক, সতর আবৃত করে না এমন পোশাক, ছবিযুক্ত পোশাক ইত্যাদি। তারা মনে করেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য শরীয়তের বিধিবিধান প্রযোজ্য নয়। কিন্তু শিশুদের ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়া তো বড়দের উপর ফরয এবং এ বিষয়ে অবহেলা-উদাসীনতা মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

তাবেয়ী আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর সাথে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তার একটি ছোট্ট ছেলে তার কাছে এল। ছেলেটিকে তার মা একটি রেশমী জামা পরিয়ে দিয়েছে। জামাটি পরে ছেলেটি খুব খুশী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ছেলেটিকে বললেন, বেটা! কে তোমাকে এই জামা পরিয়েছে? এরপর বললেন, কাছে এসো। ছেলেটি কাছে আসলে তিনি জামাটি টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, তোমার মাকে গিয়ে বল, তোমাকে অন্য কাপড় পরিয়ে দিতে। (শুআবুল ঈমান ৫/১৩৫)

উল্লিখিত মূলনীতিসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি, যেসব পোশাকে উল্লিখিত সব শর্ত পাওয়া যাবে অর্থাৎ সতর আবৃত করবে, আঁটসাঁট বা পাতলা হবে না, কোন অমুসলিম বা পাপীগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ডিজাইন হবে না, প্রসিদ্ধির পোশাক হবে না, ছবিযুক্ত হবে না, পুরুষের পোশাক মহিলাদের ডিজাইনে তৈরি হবে না আর মহিলাদের পোশাক পুরুষদের পোশাকের আদলে তৈরি হবে না, পুরুষের পোশাক রেশমের হবে না, পায়ের টাখনু ঢেকে রাখবে না ইত্যাদি– তাহলে সে পোশাক শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ পোশাক তথা সুন্নাহসম্মত/ সুন্নাহস্বীকৃত পোশাক বিবেচিত হবে।

(ছয়)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পোশাক পরিচ্ছদ

দেহ আবৃত করাই পোশাক-পরিচ্ছদের মূল উদ্দেশ্য। পোশাক সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমত শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার পোশাক। দ্বিতীয়ত শরীরের উর্ধ্বাংশ আবৃত করার পোশাক। এবং তৃতীয়ত মাথা আবৃত করার পোশাক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন প্রকারের পোশাক ব্যবহার করেছেন। শরীরের নিম্নাংশের জন্য তিনি সাধারণত ইযার বা সেলাইবীহীন খোলা লুঙ্গি ব্যবহার করতেন। পাজামা বা সেলোয়ার ব্যবহার করেছেন বলে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। শরীরের উর্ধ্বাংশের জন্য তিনি 'রিদা', 'কামিস', 'জুব্বা', 'আবাকাবা' ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। মাথা আবৃত করার জন্য তিনি টুপি, পাগড়ি, রুমাল, চাদর ব্যবহার করেছেন। নিম্নে আমরা এসব পোশাকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরব।

১। 'ইযার' ও 'রিদা'

শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য যে চাদর বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধান করা হয় তাকে ইযার বলে। আর শরীরের উর্ধ্বাংশ আবৃত করার জন্য যে চাদর ব্যবহার করা হয় তাকে 'রিদা' বলে। তৎকালীন আরবদেশের সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক ছিল 'ইযার' ও 'রিদা'। বর্তমানে হজ্জের সময় কেবল পুরুষগণ ইযার ও রিদা পরিধান করে ইহরাম ধারণ করে থাকেন। এছাড়া প্রাচীন এ আরবীয় পোশাক প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন প্রকার পোশাক পরিধান করতেন। তিনি জামা (কামীস) বেশি পছন্দ করতেন। তবে ব্যবহারের আধিক্যের দিক থেকে তিনি ইযার ও রিদা বা খোলা লুঙ্গি ও চাদরই বেশি পরিধান করেছেন। বহু হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ তাকে ইযার ও রিদা পরিহিত

৭. সহীহ মুসলিম ২/২০০, সহীহ বুখারী ২/৮৮০।

অবস্থায় দেখেছেন। তবে তিনি ইযারের নিম্নপ্রান্ত নিসফে সাক বা পায়ের গোছার মাঝামাঝি রাখতেন। তাঁর মহান সাহাবীগণ তাঁর অবিকল অনুকরণে সর্বদা এভাবে লুঙ্গি পরিধান করতেন। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া বলেন,

أن عثمان اتّزر إلى نصف الساق وقال هكذا إزرة رسول الله.

অর্থ : হযরত উসমান রাযি.'নিসফে সাক' তথা পায়ের নলির মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝুলিয়ে ইযার পরিধান করতেন এবং বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ইযার পরিধান করতেন। (মুসনাদে বাযযার ২/১৫)

২। সারাবীল, সিরওয়াল

এ শব্দটি মূলত ফারসী ভাষা থেকে গৃহীত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পাজামা, সেলোয়ার ইত্যাদি যেগুলো শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয় এবং এতে দুই পা পৃথকভাবে আবৃত হয়। পাজামা আরবদের মাঝে প্রচলিত ও পরিচিত পোশাক ছিল। পাজামা সতর আবৃত করার বেশি উপযোগী হওয়ার কারণে কোন কোন সাহাবী পাজামাকে বেশি পছন্দ করতেন। তবে সে যুগে শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য ইযারই বেশি প্রচলিত ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাজামা দরদাম করেছেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরিধানের বিষয়টি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে বুঝে আসে যে, তিনি তা ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সাহাবীগণের পাজামা ব্যবহারের বিষয়টি প্রমাণিত। (সুনানে তিরমিযী - কিতাবুল বুয়ূ ১/২৪৪)

৩। কামীস

হাতা, গলা ইত্যাদি সহ শরীরের মাপে কেটে ও সেলাই করে শরীরের উর্ধ্বাংশের জন্য প্রস্তুতকৃত পোশাককে কামীস বলে। সাধারণত কামীসের বুকের দিকে সামান্য ফাড়া থাকে যাতে বুতাম ব্যবহার করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পোশাক হিসাবে কামীসকেই বেশি পছন্দ করতেন। সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত,

كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল কামীস বা জামা। (সুনানে তিরমিযী ১/৩০৬)

সাহাবাগণের মাঝেও কামীসের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামীস পরিহিত অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেছিলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন প্রকারের জামা পরিধান করতেন। কোনটির ঝুল ছিল পায়ের টাখনু পর্যন্ত। আবার কোনটি খাটো ছিল। কোনটির হাতা ছিল হাতের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত। কোনটির হাতা কিছুটা ছোট অর্থাৎ হাতের কবজি পর্যন্ত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে কোন জামা হাঁটু পর্যন্ত বা এর চেয়ে কম ঝুলওয়ালা জামা ব্যবহারের কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না। তাছাড়া সে জামাগুলো কলার বিহীন ছিল বলেই অনুমিত হয়। তবে তা বোতাম বিশিষ্ট ছিল বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়।

৪। জুব্বা ও আবাকাবা

বুক খোলা, হাতাওয়ালা প্রশস্ত বহিরাবরণ। আরবীতে ঐ পোশাককে জুব্বা বলা হয়, যা সাধারণত মূল পোশাক জামা বা চাদরের উপরে পরা হয়। আল মু'জামুল ওয়াসীতের ১০৪নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

الجبة : ثوب سابغ واسع الكمين بشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب.

অর্থ : আবাকাবাও এক প্রকারের জুব্বা যা সাধারণত মূল পোশাকের উপর পরা হয় এবং যা সামনে বা পিছনে সম্পূর্ণ খোলা থাকে। আবাকাবাকে আরবীতে قرطة কোর্তাও বলা হয়। আল মু'জামুল ওয়াসীতে উল্লেখ আছে (পৃষ্ঠা ১০৪), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় জুব্বা বা আবাকাবা পরিধান করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত জুমআর দিনে বা সম্মানিত মেহমানদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি জুব্বা বা আবাকাবা পরিধান করতেন। (আলআদাবুল মুফরাদ-সহীহ বুখারী ১/১৪২)

৫। টুপি, পাগড়ি, রুমাল

শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় মাথা আবৃত করা প্রায় সকল জাতির নিকটই একটি মর্যাদাময় রীতি ও সৌন্দর্যের পূর্ণতা। আরবদের মধ্যে মাথা আবৃত করার জন্য প্রাচীন কাল থেকেই টুপি পাগড়ীর প্রচলন ছিল। আরবীয় কোন আচার-আচরণ পোশাক-আশাক ইত্যাদি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহাল রাখেন তাহলে তা ইসলামী বলে গণ্য হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের আলোকে এর গুরুত্ব নির্ধারিত হবে। আর আরবীয় কোন আচার, পোশাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্জন করলে বা বর্জন করতে নির্দেশ দিলে তা বর্জন করা আবশ্যক হবে এবং ইসলাম পরিপন্থী সাব্যস্ত হবে। টাখনু আবৃত করে পোশাক পরিধান করা তৎকালীন আরবীয় কালচার ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাদীসের আলোকে একথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ টুপি ও পাগড়ী পরিধান করতেন এবং মাথা আবৃত করার জন্য কখনো চাদর ও রুমালও ব্যবহার করেছেন। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো।

টুপি : টুপির জন্য হাদীসে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১। قلنسوة (কালানসুওয়াহ) ২। الكمة (কুম্মাহ) ৩। برنس (বুরনুস)

কালানসুওয়াহ সম্পর্কে আধুনিক আরবী অভিধান আল-মুজামুল ওয়াসীতে বলা হয়েছে,

القلنسوة : لباس الرأس مختلف الأنواع والأشكال.

অর্থ : কালানসুওয়াহ মাথার পোশাক, বিভিন্ন প্রকারের ও আকৃতির।

কুম্মাহ সম্পর্কে তিন রকমের ভাষ্য রয়েছে। ১) টুপি, কালানসুওয়াহ এর প্রতিশব্দ, ২) ছোট টুপি, ৩) গোল টুপি

আর বুরনুস হল পরিহিত পোশাকের সাথে সংযুক্ত মাথা ঢাকার লম্বা টুপি যা সাধারণত শীত থেকে রক্ষা করে থাকে। সাহাবীগণ বুরনুস জাতীয় টুপি পরিধান করেছেন বলে হাদীসে বর্ণনা এসেছে। (সুনানে আবূ দাউদ ১/১৯৩)

অবশ্য কেউ কেউ বুরনুস এর অর্থ লম্বা বা উঁচু টুপি বলেছেন যা প্রথম যুগের আবেদ, সুফীগণ পরিধান করতেন।

নির্ভরযোগ্য বহু হাদীস দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের টুপি পরিধানের বিষয়টি জানা যায়। কিন্তু টুপির বিশেষ কোন আকৃতি ও রঙ নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা জানা যায় না। তবে কিছু হাদীস দ্বারা নবীজীর টুপি তার মাথার সাথে লাগোয়া ছিল, সাদা ছিল তা বুঝে আসে। (সুনানে আবূ দাউদ ১/২৪৯, সুনানে তিরমিযী ১/৩০৮)

তাই যে কোন আকৃতির টুপি পরিধান করা যাবে। তবে কোন বিশেষ আকৃতির টুপি কোন অমুসলিম বা পাপীসমাজের আলামত ও বিশেষ চিহ্নে রূপান্তরিত হলে তা পরা যাবে না।

(০৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্রন্থ পরিচিতি

اسلام اور ہماری زندگی

ইসলাম ও আমাদের জীবন

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ, সফল ও সার্থক সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা। তাই ইহ ও পরকালীন জীবনে কামিয়াবীর যাবতীয় নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা এতে বিদ্যমান। জন্ম থেকে জান্নাতে পৌঁছার প্রয়োজনীয় হেদায়াত যেমন ইসলাম দিয়েছে; তেমনি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত, ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সর্বস্তরে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম পথনির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। যার বাস্তব নমুনা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই সফল ও সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা কায়েম ও দায়েম রাখতে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া উলামায়ে কেরাম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যুগের চাহিদা ও যুগের দাবি পূরণে সম-সাময়িক সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করে যাচ্ছেন। যুগের তাবৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উলামায়ে কেরাম দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত শত-সহস্র যুগোপযোগী দিক-নির্দেশনা। বিশেষ করে মুফতীয়ে আযম হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এর সুযোগ্য সাহেবযাদা, পাকিস্তানের শরয়ী আদালতের সাবেক জাস্টিস, গোটা মুসলিম উম্মাহর বিশেষ রাহবার, শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. বর্তমান সময়ের সব সমস্যার সরল সমাধান দেয়ার ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। ইসলামের এমন কোন দিক নেই যে বিষয়ে তাঁর অবদান অনুপস্থিত। সম-সাময়িক জটিল ও কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধান যেমন তাঁর কলম ও যবান থেকে বেরিয়ে আসছে, সহজ ও ছোটখাট সমস্যার সমাধানও তাঁর দৃষ্টির আড়াল হচ্ছে না। লেখনী ও বয়ানের মাধ্যমে ইসলামের সব বিষয়ে তিনি অবাধ বিচরণ করেই চলেছেন অব্যাহত গতিতে। যেমন হযরত নিজেই বলেছেন, 'নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী বছরের পর বছর ধরে যবান আর কলম চলছে অব্যাহত গতিতে। উদ্দেশ্য একটিই, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের দিকনির্দেশনা, ইসলামের হেদায়াত ও রাহনুমায়ীর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। নিজের জীবনে ও সমাজের অন্যান্য সবার জীবনে ইসলামের সোনালী দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নে এই মহান ব্রতই আমার যবান ও কলমের নিরলস প্রচেষ্টা।'

হযরতের এসকল লেখাভাণ্ডার ও বক্তৃতা-আলোচনাগুলো বের হতে থাকে ছোট ছোট বই আকারে, পত্র-পত্রিকার পাতায়। কখনো বা তা প্রকাশ হতে থাকে গ্রন্থাকারে বা রচনাসমগ্র হিসেবেও।

সম্প্রতি হযরতের ভাতিজা সাউদ উসমানী সে সব গ্রন্থ ও রচনাসমগ্র থেকে লেখাগুলোকে বিষয়ভিত্তিক একটি সঙ্কলনসমগ্র আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ওয়ারেস সারওয়ার দা.বা. এর উপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি কয়েক বছর নিরলস চেষ্টা-মেহনত করে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন লেখা ও বক্তৃতা-আলোচনাগুলোকে বিষয়ভিত্তিক চমৎকারভাবে বিন্যাস করেন। সাথে এ মূল্যবান সঙ্কলনের জন্য নির্বাচন করেন এক বাস্তবসম্মত ও নন্দিত নাম اسلام اور ہماری زندگی (ইসলাম ও আমাদের জীবন)।

গ্রন্থটির বিষয়-বিন্যাস

মাওলানা ওয়ারেস সারওয়ার দা.বা. গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে সমাপ্ত করবেন বলে জানা গেছে। আমাদের জানামতে এ পর্যন্ত ১৫ খণ্ডের মত প্রকাশিত হয়েছে; তবে আমাদের হাতে এসেছে ১৪ খণ্ড পর্যন্ত।

মুহতারাম দূরদর্শী সঙ্কলক ১৪ খণ্ডের এই বিশাল ইলমী ভাণ্ডারকে যেভাবে বিন্যাস করেছেন-

১ম খণ্ড : ইসলামী আকাইদ।

২য় খণ্ড : ইবাদাত-বন্দেগী।

৩য় খণ্ড : ইসলামী মু'আমালাত।

৪র্থ খণ্ড : ইসলামী মু'আশারাত।

৫ম খণ্ড : ইসলাম ও পারিবারিক জীবন।

৬ষ্ঠ খণ্ড : তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি।

৭ম খণ্ড : মন্দচরিত্র ও তার সংশোধন।

৮ম খণ্ড : উত্তমচরিত্র।

৯ম খণ্ড : ইসলামী জীবনের কল্যাণময় আদব।

১০ম খণ্ড : দৈনন্দিন কাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দু'আ ও আমল।

১১তম খণ্ড : ইসলামী মাস সমূহ।

১২তম খণ্ড : সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমাদের জীবন।

১৩তম খণ্ড : দীনী মাদরাসা, উলামা ও তলাবা।

১৪তম খণ্ড : ইসলাম ও আধুনিক যুগ।

এছাড়াও সাজানোর ক্ষেত্রে যে সব বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা হল-

- প্রতি খণ্ডের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ একই বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডার একখণ্ডে একসঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে একই বিষয়ের প্রতিটি মাযমূনকে অনায়াসে পড়তে ও আত্মস্থ করতে, প্রতিটি খণ্ডের বিষয়বস্তুকে মৌলিক ও শাখা-শিরোনামে চমৎকারভাবে, খুবই দূরদর্শিতার সাথে বিন্যাস করা হয়েছে।
- এতে আলোচিত সকল আয়াত, হাদীস, আসার ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত, হাদীস, আসার ও আরবী বাক্যমালায় হরকত লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।
- এই সঙ্কলনে এমন বহু লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা এর আগে ছাপা আকারে বের হয়নি।

ভাষান্তর

উর্দূ ভাষায় সঙ্কলিত ১৪ খণ্ডের এই বিরাট মহামূল্যবান গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়া ছিল সময়ের একান্ত

দাবী। আলহামদুলিল্লাহ! প্রতিষ্ঠিত লেখক, সাহিত্যিক ও অনুবাদক মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল গফ্ফার, মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ, মাওলানা জালালুদ্দীন ও মাওলানা মুহিউদ্দীন সাহেব দা.বা. এই ৫ জনের সমন্বিত অনুবাদে গ্রন্থটি 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' নামে মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে ১৪ খণ্ডে মজবুত বাঁধাই ও ঝকঝকে কাগজে ছেপে এখন বাজারে।

এছাড়াও বিশিষ্ট সাহিত্যিক, 'দৈনিক আমার দেশ' এর সহসম্পাদক ও দক্ষ অনুবাদক মুফতী মুহাম্মাদ তায়্যেব হোসাইন দা.বা. এর একক অনুবাদে, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ও মাওলানা আবূ তাহের মুহাম্মাদ সালেহ দা.বা. এ দু'জনের সম্পাদনায় গ্রন্থটি 'ইসলামী জীবনব্যবস্থা' নামে বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স থেকে (১-১০খণ্ড) মজবুত বাঁধাই ও সুন্দর অফসেট পেপারে ছাপা হয়েছে।

আশা করি গ্রন্থটি অতিসত্বর অন্যান্য সকল ভাষায়ও অনূদিত হয়ে গোটা মুসলিম জাতিকে উপকৃত করবে ইনশাআল্লাহ।

বৈশিষ্ট্যাবলী

- শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. এর লেখনী ও বয়ানের সঙ্কলিত এই বিশাল গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনব্যবস্থার আরশিতুল্য। যে কোন মুসলমানের ইসলামী জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গাইডলাইন বলা চলে।
- সমকালীন যুগে যুগের সব সমস্যার সহজ সমাধান সমেত এমন একটি গ্রন্থ বিরল ও নজীরবিহীন। প্রতিটি মুসলিম পরিবারে এই গ্রন্থটি নিয়মিত তা'লীম হলে আদর্শ ব্যক্তি, আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই গ্রন্থটি চর্চিত হতে থাকলে ইসলামের বহু জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান নিজেদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে বলে আমাদের ধারণা।
- ইমাম-খতীবদের সমাজ সংশোধনী বয়ান আলোচনার প্রায় সব উপাদানই রয়েছে এই গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি তাঁদের সংগ্রহে থাকলে মুসলিম উম্মাহর সামনে সমকালীন যে কোন সমস্যার ফিলহাল সমাধান পেশ করতে তাঁরা সক্ষম হবেন। খুব সহজেই তাঁরা তাঁদের আলোচনা-বয়ানের খোরাক এই একটি গ্রন্থের মাঝেই পেয়ে যাবেন।
- ওয়ায়েয ও বক্তাগণের জন্যও এই গ্রন্থটি অমূল্য সংগ্রহশালা হিসেবে বিবেচিত হবে।
- আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার এবং এ পথের পথিকদের জন্যও গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী।
- মাদরাসা ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জীবন গঠন ও আদর্শ ছাত্র হিসেবে উন্নত জীবন গড়ার জন্য এই সঙ্কলনটির ভূমিকা সীমাহীন।
- আধুনিক শিক্ষিত সমাজের জন্য সহজেই ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার এর থেকে যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধ কোন গ্রন্থ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

মোটকথা, সর্বদিক বিবেচনায় সঙ্কলনটি অনবদ্য ও অনুপম। বর্তমান যুগচাহিদার উত্তম ও উৎকৃষ্ট সমাধান। গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য এটা যেন আল্লাহ তা'আলার এক মহানেয়ামত ও মহাদান।

প্রিয় পাঠক! বিশ্ববিখ্যাত ও বিশ্বনন্দিত এই মহান ব্যক্তির বয়ান-বক্তৃতা ও লেখনীর ভাব ও প্রভাব, মর্ম ও মান যে কত গভীর ও আকাশচুম্বী তা কারো অজানা নয়। সেগুলো যদি আবার সুবিন্যাস্তাকারে বিষয়ভিত্তিক সঙ্কলন হয়ে আসে তাহলে তার উপকারিতা ব্যাপৃতি কেবল অনুধাবন সম্ভব; বোঝানো সম্ভব নয়। তাই ১৪ খণ্ডের এই বিশাল ইলমী ভাণ্ডারের পরিচয়-পরিচিতি দুই পৃষ্ঠায় পেশ করা যে সমুদ্রকে পেয়ালায় পরিবেশনের দুঃসাহস তা সহজেই অনুমেয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে اسلام اور ہماری زندگی 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' গ্রন্থটি বারবার পাঠ করে ইসলামকে আমাদের জীবনের পরতে পরতে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করেন। আমীন; ইয়া রব্বাল আলামীন।

লেখক : মুদাররিস,আশরাফুল মাদারিস
সতীঘাটা, পান্তাপাড়া, সদর যশোর

(২৫ পৃষ্ঠার পর; বদযবানী, বদগুমানী...)

আর যে ব্যক্তি প্রিয় নবীজীর হুকুম পালন করবে নিঃসন্দেহে সে পুরস্কার ও সওয়াবের উপযুক্ত হবে। অতএব কুধারণা করে নিজেকে নিজে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার আদালতের আসামী করা এবং কঠিন বিপদের সম্মুখীন করা বড়ই নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকী। (হযরত হেসে বলেন,) 'কত বড় আহাম্মক ও বেওকুফ ঐ ব্যক্তি, যে বিনা পরিশ্রমে সওয়াব অর্জনের পরিবর্তে নিজেই নিজের উপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে মোকাদ্দমার ব্যবস্থা করছে।'

অতএব হে ঈমানদারগণ! অন্যের প্রতি সুধারণা পোষণ করে বিনা পরিশ্রমে সওয়াব অর্জন করো এবং কুধারণা করে নিজেকে প্রমাণাদী পেশের মোকাদ্দমায় ফাঁসিয়ে দিও না।

বদগুমানী বা কুধারণা হয় কেন?

কুধারণা আসলে এক প্রকার ওয়াসওয়াসা। ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা খুবই মারাত্মক ব্যাধি। যখনই কারো প্রতি কুধারণার ওয়াসওয়াসা এসে যায় তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে আপন নফসকে ধিক্কার দেয়া উচিত। যদি উক্ত কুধারণার ওয়াসওয়াসাকে দেমাগে বসে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে একপর্যায়ে এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, পেরেশানীতে দুনিয়াবী জীবন একেবারেই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এবং দুনিয়া সঙ্কীর্ণ মনে হয়। কিন্তু যখনই উক্ত কুধারণার মূল রহস্য ফাঁস হয়ে যায় অর্থাৎ যখনই কুধারণাকারী কোন বাস্তব দলীলের ভিত্তিতে জানতে সক্ষম হয় যে, আমার উক্ত ধারণার কোন ভিত্তি নেই, আমি যা ধারণা করেছিলাম বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত, তখন কুধারণাকারীর আফসোসের পর আফসোস ছাড়া আর কিছুই থাকে না। নিজের নফসকে তখন ধিক্কার দিতে থাকে যে, কেন অমুকের নির্দোষ চরিত্রের প্রতি কুধারণা করে এত দীর্ঘ সময় কষ্ট-দুঃখ ও পেরেশানীতে ব্যয় করে জীবনের একটা মূল্যবান সময়কে গুনাহে ডুবিয়ে রেখেছিলাম? এজন্য যখনই কারো প্রতি কোন প্রকার বাস্তব দলীল ব্যতীত কুধারণার ওয়াসওয়াসা এসে উঁকি দেয় তখনই সেটাকে দিল থেকে একেবারে দূর করে দেয়া জরুরী। সম্ভব হলে যে কোন খারাপ ধারণা মনে আসার সাথে সাথে তার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা করে নেয়া উচিত।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে উক্ত বড় বড় তিনটি গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন ও তার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন।

অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ আলী কাসেমী
মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি'আ ইসলামিয়া,
লালমাটিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সাকানাহ, মাওয়াদ্দাহ, রাহমাহ

মাওলানা রূহুল আমীন

মানুষ জ্ঞান-গম্যিতে যত বড় হয়, কথা ততই কমতে থাকে। মানুষেরই যদি এ অবস্থা হয়, আল্লাহ তা'আলার কথা কেমন হবে? বিয়ে শাদী বিষয়ক আয়াতগুলোর দিকে তাকালেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। মাত্র তিনটি শব্দে কুরআনে কারীম পুরো দাম্পত্য জীবনকে তুলে ধরেছে। কয়েকটি আয়াতের ভাব-তরজমা দেখি–

১. তিনিই পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক আত্মীয়তা দান করেছেন। (সূরা ফুরকান- ৫৪)

২. আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদেরকে এক সত্তা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া বানিয়েছেন। যাতে সে তার কাছে এসে শান্তি লাভ করতে পারে। (সূরা আ'রাফ- ১৮৯)

৩. নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ করো। (সূরা নিসা- ৩)

৪. তারা তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক। (সূরা বাকারা- ১৮৭)

৫. তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে সেইসব লোকের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা রূম- ২১)

৬. আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের প্রতি স্বামীদেরও অধিকার রয়েছে। (সূরা বাকারা- ২২৮)

৭. পুরুষ নারীদের অভিভাবক। যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে। (সূরা নিসা- ৩৪)

আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলে অনেক অনেক দিক ধরা পড়ে। তাফসীরের কিতাবগুলোতেও দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। এতে চমৎকার সব দিক উঠে এসেছে! আমরা শুধু শিরোনামের তিনটা শব্দ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলছি,

এক. বিয়ে শাদী আল্লাহর অপূর্ব এক নিদর্শন। আয়াত। তুচ্ছ কোনও বিষয় আল্লাহর নিদর্শন হতে পারে না।

দুই. বিয়েটা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্যেই শান্তি ও প্রশান্তি। সাকান (سكن)। সান্ত্বনা। প্রবোধ। নিরাপদ আশ্রয়। নির্ভরতা। যাবতীয় অস্থিরতা দূরকারী।

তিন. বিয়ে দু'টি মানুষের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টির মাধ্যম। মাওয়াদ্দাহ (مودة) সৌহার্দ্যের উৎস। মাওয়াদ্দাহর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার প্রবল তাড়না থাকে। তামান্না থাকে। যৌবনে যা হয়ে থাকে। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে থাকে! দূরে গেলে কাছে টেনে নিয়ে আসে। অদৃশ্য এক সম্মোহনী শক্তি দু'জনকে বেঁধে রাখে। অদেখা এক বাঁধন দু'জনকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রাখে। যৌবনের সম্পর্ক বোঝানোর জন্যে মাওয়াদ্দাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

চার. বিয়ের প্রথম দিকে পরস্পরের প্রতি জৈবিক আকর্ষণ থাকলেও শেষ বয়সে এসে এই তাড়না আর প্রবল থাকে না। তখন দু'জনের মধ্যে নেয় এক ধরনের নির্ভরতা। না বলা এক অনুরাগ। রহমত (رحمة)। দয়া। অচ্ছেদ্য এক বাঁধন! বার্ধক্যের সম্পর্ককে বোঝানোর জন্যে রহমত ব্যবহার করা হয়েছে।

সাকানাহ

মানুষটা প্রচলিত অর্থে নিরক্ষর। পেশায় বাবুর্চি। তাবলীগের মেহনতের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত! উজানী মরহুম পীর সাহেবের হাতে বায়আত। বুঝ হওয়ার পর থেকেই ওলামায়ে কেরামের সাথে ওঠাবসা। এজন্য এক মাদরাসার প্রবীণ প্রধান মুফতী সাহেব নিজের মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছেন। মানুষটার তাকওয়া ও পরহেযগারী দেখে।

কওমী মাদরাসায় মাসিক ওযীফা (বেতন) সব সময় নিয়মিত সময়মতো পাওয়া যায় না। (এখন হয়তো দিনকাল বদলেছে)। এমনকি ঈদের সময়ও পুরো বেতন মেলে না। ফান্ডে টাকা থাকে না যে! আমরা তাকে খাদেম সাহেব বলে ডাকি। চার সন্তান। দুই ছেলে হাফেয। মানুষটার সাথে অনেক লম্বা সময় নিয়ে কথা বলি। তার সারল্যমাখা দীনদারি সত্যিই মুগ্ধ করে। কোনও ভান নেই। কে কী বললো, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সময় হলে যিকির করছে। পীর সাহেবের সবক আদায় করছে। বিয়ের আগে এমনও হয়েছে, সারাক্ষণ যিকিরের কারণে আশেপাশের লোকজন তাকে পাগল ডাকতে শুরু করেছিল। হাদীসে আছে না, তুমি এমনভাবে আল্লাহর যিকির করো, যাতে তোমাকে পাগল মনে করে! খাদেম সাহেব যেন হাদীসেরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

হুযুরের মেয়ের প্রস্তাব পেয়েও এই নিরক্ষর মানুষটা অত্যন্ত ভদ্রভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল সেই প্রস্তাব! বড্ড কৌতূহলী হলাম!

-কেন এতবড় একটা সৌভাগ্যকে পাশ কাটিয়ে গেলেন?

-আমি কিভাবে হুযূরের মেয়েকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারি? উনি কতবড় আলেম মুফতী! তার মেয়েও সবদিক দিয়ে যোগ্য! আমি খোঁজ নিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি! আমার ঘরবাড়ি নেই! চালচুলো নেই। কোথায় রাখবো এমন মেহমানকে? আমি সব সময় হুযূরের খেদমত করি, হুযূরের সাথে গাশতে যাই, হুযূরের সাথে শবগুজারি করি। একসাথে থাকতে থাকতে আমার প্রতি হুযূরের মহব্বত কায়েম হয়ে গেছে! হুযূর মহব্বতের তাকিদেই মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন! এখন আমারও উচিত সেই মহব্বতের প্রতিদান দেয়া! এবং বিয়ে না করাই ছিল সেই মহব্বতের তাকিদ! অবশ্য বিয়ে না করার পেছনে আরেকটা প্রধান কারণ ছিল!

-কী কারণ?

-আমাদের বাড়ির পাশে একটা গরীব পরিবার ছিল। তাদের একটা মেয়ে ছিল। খবর পেয়েছি মেয়েটা মা'যূর। পায়ে সমস্যা আছে। মেয়ের বাবা মাদরাসার শিক্ষক। অত্যন্ত গরীব। মেয়ের বিয়ে নিয়ে খুব বেশি পেরেশান না হলেও, আমি দেখেছি, হুযূর প্রতিদিন মাগরিবের পর দীর্ঘক্ষণ কেঁদে কেঁদে দু'আ করেন। একদিন হুযূরের দু'আর একটা বাক্য আমাকে বেশ নাড়া দিল! হুযূর আল্লাহর কাছে বারবার বলছেন,

-আমার মেয়েটার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মেয়েটা বড় হয়ে গেছে! আমি গরীব বলে খরচ করে বিয়ে দেয়ার তাওফীক নেই। পঙ্গু বলে তাকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। সম্বন্ধ ফিরে যাচ্ছে। ও আল্লাহ! মেয়েটাকে পঙ্গু তো

আপনিই বানিয়েছেন! আমাকে কখনো এ-নিয়ে আপনার কাছে অভিযোগ করতে দেখেছেন? জন্মের পর তাকে পঙ্গু দেখার পরও আমার মনে সামান্যতম আক্ষেপ জাগেনি! আপনি আমাকে মেয়ের হাদিয়া পাঠিয়েছেন, হোক না পঙ্গু, আমার এখানে আক্ষেপ করার কী আছে! মাওলা! আপনি আমার মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মেয়েটা বড় বেশি মনোকষ্টে আছে! তার সমবয়সীদের বিয়ে অনেক আগেই হয়ে গেছে! তার ছোটদেরও প্রায় সবার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি জানি, আপনি যা করেন বান্দার ভালোর জন্যেই করেন! এজন্য আমি সবর করে থাকতে পারি! কিন্তু মেয়ের মা যে কষ্ট সহ্য করতে পারছে না! মেয়েটাও দিনদিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে!

হুযূরের মুনাজাত শোনার পরপরই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম– আমি এখানে সম্পর্ক করবো। অন্তত প্রস্তাব দিয়ে দেখবো! আল্লাহর কী অদ্ভুত মহিমা! পরদিন আমি আমার হুযূরের খেদমতে হাজির হলাম! একথা-সেকথার পর হুযূর নিজের মেয়ের প্রস্তাব নিজেই পেশ করলেন। আমি চমকে উঠলাম! এতদিন আমি গরীব বলে আমার কাছে কেউ মেয়ে বিয়ে দেয়ার কথা কল্পনাও করতো না! অথচ এখন দেখি চারদিক থেকেই বিয়ের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে! আমি আরেকদিন সময় সুযোগ মতো হুযূরকে বললাম,

-আমাকে মাফ করতে হবে!

-কিসের মাফ!

-আমি বিয়েটা করতে পারবো না!

-কেন, কোনও সমস্যা?

-জ্বি না হুযূর! কোনও সমস্যা নেই!

-তাহলে?

তখন হুযূরকে সবকিছু খুলে বললাম,

-আমি যেই হুযূরের মেয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তিনিও মুফতী সাহেব হুযূরের মাদরাসারই শিক্ষক! আমি মাফ চেয়ে একটা কথা বলেছিলাম! হুযূর কথাটা শুনে সাথে সাথে শোয়া থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে বললেন,

-...সুর! তুই যে এত ভালো মানুষ, সেটা আগে বুঝতে পারিনি কেন?

-খাদেম সাহেব! আপনি মুফতী সাহেব হুযূরকে কী বলেছিলেন? যার কারণে তিনি এমন অভিভূতের মতো আচরণ করলেন?

-আমি বলেছিলাম, হুযূর! আপনার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে বড় বড় শাইখুল হাদীস লাইন ধরে আছে! আমি খবর পেয়েছি! এমনকি ঢাকার দীনদার এক কোটিপতিও তার ছেলের বউ করার জন্যে হুযূরের কাছে কাকরাইলে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল! হুযূর যেবার বিদেশে তিন চিল্লার সফর থেকে ফিরেছিলেন সেবার!

আমি চিন্তা করে দেখেছি! যে মেয়েকে বিয়ের জন্যে সবাই লাইন ধরেছে! তাকে বিয়ে করা উচিত, নাকি যাকে কেউ বিয়ে করতে চাচ্ছে না, তাকে বিয়ে করা উচিত? পর্দা-পুশিদায় দু'জনই সমান, জ্ঞান-গরিমায়ও হয়তো উনিশ-বিশ হতে পারে! শুধু একটু খুঁত! অবশ্য এ-জায়গায় বিয়ে করলে, আমার টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবতে হতো না! হুযূরই সব কিছু করে দিতেন। কিন্তু সব তো আল্লাহই দেন! আবার ছিনিয়েও নেন! বিয়ে শাদী হলো ইবাদত! এটা হুযূরের বয়ানেই শুনেছি! আমার কাছে মনে হয়েছে, মা'যূর মেয়েটাকে বিয়ে করলেই বেশি ইবাদত হবে। আল্লাহ বেশি খুশি হবেন!

একথা শুনে, মুফতী সাহেব হুযূর নিজেই পাত্রের পিতার ভূমিকা নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। মেয়ের বাবা এক কথায় রাজি! পাত্র যদিও একটু পাগলা টাইপের! তা হোক! ছেলেটা আল্লাহর পাগল! বিয়ে হয়ে গেলো!

খাদেম সাহেব বললেন,

-পরিবারের পায়ে সমস্যা থাকার কারণে ভারী কাজ করতে পারে না। আমাকে বাইরের কাজ সেরে ঘরের কাজেও হাত লাগাতে হয়। কিন্তু আল্লাহ আমাকে সুখী করেছেন!

কুরবানীর ঈদে সেবার চামড়া কালেকশন শেষ হলো। কিন্তু বড় হুযূরের হাতে একটা টাকাও নেই। সাধারণত মাদরাসার ফান্ড থেকে টাকা তুলে চামড়া কেনা হয়। পরে চামড়া বিক্রি করে টাকাটা আবার জেনারেল ফান্ডে জমা করে দেয়া হয়। এবারও তাই হলো! সব টাকা চামড়াতে আটকে গেলো। এক প্রভাবশালী নেতা সব চামড়া নিজেই কিনবেন বলে নিয়ে গেলেন! টাকাটা সময়মতো দিলেন না! হুযূরদের বেতন দেয়া যাচ্ছে না। সবার মন ভীষণ খারাপ! বড় হুযূর কিছু না খেয়ে মসজিদে গিয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছেন! অন্য হুযূররা যে যার মতো করয-হাওলাত করে বাড়ি চলে গেছেন। খাদেম সাহেবের কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। খাদেম সাহেবের মতো আরেকজনেরও প্রায় একই অবস্থা। সেই আরেকজন মনের কষ্ট মনে চেপে, খাদেম সাহেবকে বললেন,

-আমার কাছে কিছু টাকা আছে, সেটা দিয়ে আমার বাড়ি যাওয়া পোষাবে না! তবে মনে হচ্ছে আপনার হয়ে যাবে!

-কিন্তু শুধু ভাড়া হলেই তো হবে না! অন্য খরচ-বিরচ আছে না!

-আপনি আপাতত চলে যান! ইনশাআল্লাহ দু'দিন পর চামড়ার টাকা পাওয়া গেলে, আপনার জন্যে পাঠিয়ে দেবো!

-আচ্ছা! কিন্তু হুযূর! আমার জন্যে আপনি বাড়ি গেলেন না!

-জ্বি না! তা নয়। এ-টাকা দিয়ে আমার বাড়ি যাওয়া যাবে না! আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যান!

-এভাবে শুধু ভাড়ার টাকা নিয়ে বাড়ি যেতে শরম লাগছে! ছুটকিয়ারা (বাচ্চারা) সবাই অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে! আব্বু আসবেন! তাদের জন্যে কিছু নিয়ে যাবেন! খালি হাতে কিভাবে যাই! আগে একবার বাড়িতে যোগাযোগ করি! দেখি ওদিকের কী পরিস্থিতি!

খাদেম সাহেব চিন্তিত ভঙ্গিতে দোকানে গেলেন ফোন করতে। তখন এক মিনিট সাত টাকা করে নিতো। আর গ্রামে রিসিভ করলেও টাকা দিতে হতো! একটু পর মানুষটা হাসতে হাসতে ফিরে এলো!

-কী ব্যাপার! গেলেন কাঁদতে কাঁদতে! ফিরে এলেন হাসতে হাসতে! টাকার ব্যবস্থা হয়েছে?

-জ্বি না!

-তবে?

-পরিবারের কথা শুনে হাসছি!

-কী কথা, শুনি?

-আমি বললাম বেতন হয়নি এবার আসতে পারছি না! সে জানতে চাইল, ভাড়ার টাকা আছে কি না! বললাম আছে! সে বললো, আপনিই আমাদের কাছে বড় ঈদ! টাকা-পয়সা লাগবে না! আপনি আসুন! অবশ্যই আসুন!

-ভালোবাসতে কি পা লাগে? ভালোবাসা কি পা দিয়ে হয়? ভালবাসার জন্যে কলব লাগে! দিল লাগে! তার পা না থাকলেও বড় একখান দিল আছে। কলব আছে। মন আছে।

মাওয়াদ্দাহ

আমাদের হুযূর বিয়ে করেছেন উলার বছর। মানে মিশকাত পড়ার সময়। মাওলানা হওয়ার এক বছর আগে। হুযূর এমনিতে ভাবগম্ভীর! ব্যক্তিত্বসম্পন্ন! এক দুর্বল মুহূর্তে তিনি আমাদের কাছে বিয়ের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেছিলেন,

-বাড়ি থেকে সবাই ধরে বিয়ে করিয়ে দিল। পূর্ব কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই। আব্বু ছিলেন মাওলানা। তিনি বলতেন উপযুক্ত

হয়েছ, বিয়ে করিয়ে দিলাম। যাতে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারো। বিয়ের পর মাদরাসায় এলাম। দুষ্ট সাথীরা ছেঁকে ধরলো। তাদেরকে কারগোযারী শোনাতে হবে! আচ্ছা, তোরাই বল, দু'জনের একান্ত বিষয়গুলো কাউকে বলা যায়! না বলা উচিত! কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা!

এদিকে আমার হয়েছে এক জ্বালা! সামনে মারকাযী পরীক্ষা! খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে! অথচ কিতাবের পাতায় মন বসাতে পারছি না। মিশকাতের শরাহ মিরকাতটা ভালোভাবে পড়তে হবে! কারণ বেশির ভাগ প্রশ্ন এই কিতাবকে সামনে রেখেই হয়! আগের প্রশ্নগুলো যাচাই করে দেখেছি! কী করি! কিতাবের পাতা ওল্টালেই তাইনের ছবি দেখি! সে হাসছে! পুরো কিতাবের পাতা জুড়ে! হাসছে আর যেন বলছে! এসব পড়ে কী হবে! একবার দেখা করে যান না!

সারাক্ষণ আমার মনমরা ভাব দেখে সাথীদের টনক নড়লো!

-কী রে তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কোনও সমস্যা!

-না না, আমি ঠিক আছি!

-কিছু একটা তো হয়েছেই! নিশ্চয় বাড়ির কথা মনে পড়েছে!

-ঠিক কি না বল!

-ইয়ে মানে! একটু-আধটু তো মনে পড়বেই! কিন্তু সমস্যা হলো পড়ায় মন বসাতে পারছি না! কিতাবের পাতা ওল্টালেই শুধু তার চেহারা ভেসে ওঠে! তার কথা মনে পড়ে! রাতে ঘুম হয় না। নামাযে দাঁড়ালে সূরা পড়ার কথা ভুলে কোন ফাঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা ভাবতে থাকি!

-তোর অবস্থা তো সিরিয়াস রে! দ্রুত বিহিত করা দরকার! তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে!

-ডাক্তার! তার কাছে গিয়ে কী হবে? আমি পুরোপুরি সুস্থ! আর হাতে একটা টাকাও নেই!

-আরে ব্যাটা! হসপিটালের ডাক্তার নয়! আসল ডাক্তার! টাকার ব্যবস্থা? সে দেখা যাবেখন!

সাথীরা আমাকে মিরকাতের সামনে বসিয়ে রহস্যময় মুচকি হাসতে হাসতে চলে গেলো। আমি আবার মিরকাতের পাতায় পাতায় তাইনের ছবি দেখে সময় গুজরান করতে লাগলাম! পরীক্ষার খেয়ার চলছে। ক্লাস নেই। শুধুই পরীক্ষার প্রস্তুতি! আমার পড়াশোনা সব বন্ধ হয়ে গেলো! কিছু একটা করতেই হবে! এভাবে চলতে দেয়া যায় না!

মাগরিবের পরে হাঁপাতে হাঁপাতে দুই সাথী এলো। জোর করে আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললো,

-এখুনি শ্বশুর বাড়ি চলে যা! দেখা করে আয়!

-পঞ্চাশ টাকা! এত টাকা কোথায় পেলি?

-আমদের মিশকাত জামাতের সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলেছি!

-মান-ইজ্জত সব শেষ করে দিলি!

-মান-ইজ্জত নিয়ে পরে ভাবা যাবে! এখন তুই রওয়ানা দে তো! নইলে দেরী হয়ে যাবে!

-নৌকা পেয়ে গেলে রাত বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবো! অনেক দূর হাঁটতে হয় তো! তোরা কেউ সাথে যেতে পারবি? আমার একা এতদূর যেতে ভয় লাগবে! নাহলে আগামী কাল ফজর পড়ে যাই?

-তোর যা মুমূর্ষু অবস্থা দেখছি! তুই আরেক রাত টিকবি বলে মনে হচ্ছে না! আচ্ছা আমরা দু'জন সাথে যাবো! তবে ঘরে প্রবেশ করবো না! দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে আসবো!

-যাহ! এটা হয় নাকি! আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে তোরা এমন রাত-দুপুরে খালিমুখে চলে আসবি? তারচেয়েও বড় কথা এতরাতে তোরা ফিরবি কী করে?

-কেন পায়ে হেঁটে! শরহে আকায়েদের চল্লিশটা মাসআলা তাকরার করতে করতে পথ ফুরিয়ে যাবে! তাছাড়া আগামীকাল মাদরাসার ধান কাটতে হবে! আমাদের জামাতের দায়িত্ব! তোর নাম আমরা কোনভাবে আড়াল করে রাখবো! পরে হুযূরের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে নেবো!

-নাহ, গেলে হুযূরের কাছ থেকে ছুটি নিয়েই যাবো! আর তোরা দু'জন তো জায়গীরে থাকিস! ছুটি নেয়ার প্রয়োজন নেই! ফজরের পরপর মাদরাসার যমীনে উপস্থিত হয়ে গেলেই হলো!

কালক্রমে হুযূর শিক্ষক হলেন। জীবনসঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা-মাওয়াদ্দাহ-ও যেন পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগলো। প্রতি বৃহস্পতিবার এলেই হুযূর চঞ্চল হয়ে উঠতেন। আল্লাহর কী ইচ্ছা, হুযূর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। একটা পা দিনদিন নিঃসাড় হয়ে পড়ছে! চলতে ফিরতে ঠিকমতো সাড়া দিচ্ছে না পা'টা! দ্রুত চিকিৎসা দরকার! ডাক্তার বললেন, অপারেশন করতে হবে! ঘটনা এত দ্রুত ঘটলো, হুযূর বাড়ি গিয়ে বিদায় নেয়ার সুযোগও পেলেন না। আর বাড়ি যাবেনই-বা কী করে! দীর্ঘ পায়ে-হাঁটা পথ পাড়ি দেয়া এই অবস্থায় মোটেও সম্ভব নয়। দু'জন মিলে ধরাধরি করে হুযূরকে সব কাজ করাতে হয়। দরসেও আমরা কয়েকজন এসে ধরাধরি করে নিয়ে যাই!

বাড়ি থেকে খবর এলো! অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগে, একবার অবশ্যই যেন দেখা হয়! কিন্তু কী করে? শেষে ঠিক হলো! আম্মাজানকে নিয়ে আসা হবে! মাদরাসার পাশের এক বাসায়! তাই করা হলো! আমরা হুযূরকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি! বিদায় নেয়ার পালা চুকে গেলে মাদরাসায় নিয়ে যাবো! ভেতর থেকে ফোঁপানির বোবা আওয়াজে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়লাম। হুযূর বারবার কান্নাভেজা স্বরে বললেন,

-মুবারাকা! এটা অত্যন্ত সাধারণ অপারেশন! ঝুকি নেই বললেই চলে!

দু'জনের অনুচ্চার কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে আমাদের খারাপ লাগছিল! অবশ্য হুযূরের আওয়াজই শুধু শোনা যাচ্ছিল! তাও সবটা নয়, ছাড়া ছাড়া! দূরেও যেতে পারছি না! ডাকার সাথে সাথেই হাজির থাকতে হবে! তারপরও হুযূরের মুখে সেই 'মুবারাকা' ডাকটা এত বছর পরও কানে লেগে আছে! এত সুন্দর করে কেউ কাউকে ডাকতে পারে! এত আদর করে? এত মায়া করে? এতটা ভালবাসা মাখিয়ে? এতটা করুণ করে? স্বপ্ন ছিল আমিও হুযূরের মতো করে ডাকবো! চেষ্টাও করেছি! হুযূরের সেই ডাকে এমন কিছু ছিলো, আমি তার সিকিভাগও ডাকের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি? আচ্ছা, পেয়ারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আয়েশাকে আদর করে 'হুমায়রা' ডাকতেন? সেটা কেমন শোনাতো? রেকর্ড থাকলে মন্দ হতো না!

হুযূর দরজায় টোকা দিলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন। দরজাটা তখনো সামান্য ফাঁক! আমরা এগিয়ে যেতেই দরজার ওপাশ থেকে ঠাস করে আওয়াজ এলো। দরজার কপাট জোরে লেগে আওয়াজটা হয়েছে। আমরা এগুতে পারছিলাম না। হুযূরের জামা দরজায় ভেতরে আটকে গেছে! দরজাটা ফাঁক করে জামার কোন ধরে টান দিলাম! আসে না! হুযূর বুঝতে পারলেন ভেতর থেকে জামা টেনে ধরে রাখা হয়েছে! কান্নার গমকে হুযূরের পুরো পুরো শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো! কিন্তু নিজেকে শক্ত করলেন। জোর করে জামাটা ছুটিয়ে রওয়ানা দিলেন। পরে খবর পেয়েছিলাম, আম্মাজান হুযূরকে বিদায় দেয়ার পর

বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। জামার খুঁটটা তখন তার হাতে ধরা ছিল! স্বামীর প্রতি ভালোবাসা এতটা গভীর হতে পারে! অবশ্য এ-ভালোবাসার সাথে জীবনের আশঙ্কা জড়িয়ে ছিল! তাই গ্রামের এক সরল বধূর মনটা নানা দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল!

হুযূর যতদিন হাসপাতালে ছিলেন, আমরা উভয়দিকের যাবতীয় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। প্রতি সপ্তাহে একজন গিয়ে বাড়ির বাজার করে দিয়ে এসেছি। এদিকে হাসপাতালে হুযূরের খেদমতেও কোনও ঘাটতি পড়তে দেইনি। তবে মজার ব্যাপার হলো। আমাদের প্রায় সবাই সম্মিলিত অলিখিত একটা চুক্তিতে একমত হয়েছিল,

-বিয়ে করতে হলে, 'মুবারাকা' নামী কাউকে খুঁজতে হবে! সমনামী পাওয়া না গেলেও, এমন করে ভালোবাসতে পারে, তেমন কাউকে ঘরণী করতে হবে! তারপর আমরাও তাকে মিহি স্বরে ডাকবো– 'মুবারাকা'!

রাহমাহ

বুড়ো হয়ে গেছেন। তবুও প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যাওয়া চাই-ই চাই! মাদরাসা থেকে বাড়ি বেশি দূরে নয়। আবার কাছেও নয়। প্রায় আট-নয় কিলোমিটার তো হবেই। হুযূর যেতেন পায়ে হেঁটে! ফিরতেনও পায়ে হেঁটে! মাঝেমধ্যে ফিরতেন রিকশায় চড়ে। শাড়ি দিয়ে ঢাকা রিকশা। নামতেন মাদরাসা থেকে বেশ দূরে। তারপর হেঁটে বাকি পথ। ব্যাপারটা বেশি দিন চাপা রইল না। দুষ্ট ছেলের দল তদন্ত শুরু করলো। চমকপ্রদ রিপোর্ট এলো! হুযূরের নাতির কাছেই ঘনীভূত রহস্যের সমাধান মিলল!

-রিকশা শাড়ী দিয়ে ঢাকা থাকে কেন রে?

-দাদাজি একা আসেন না তো! সাথে দাদীজানও আসেন।

-আচ্ছা, তাই নাকি! উনি কেন আসেন?

-দাদুর নাকি দাদাজিকে একা ছাড়তে ইচ্ছে করে না! বিদায় দিতে সাথে আসেন!

-তাই বলে এই বুড়ো বয়েসে এতদূর! আমরা জানতাম স্বামী তার স্ত্রীকে বিদায় দিতে ঘর থেকে বাইরে আসে, এখন দেখছি তার উল্টো!

-দাদাজি কতোভাবে মানা করেন! নিষেধ করার পরও না শুনলে কার কী? আর রিকশাও আমাদের বাড়ির! চালক অবশ্য আমার বড় চাচার ছেলে!

-রিকশা চালায় বুঝি?

-না না, তিনি মাদরাসার শিক্ষক! দাদা-দাদুকে পৌঁছে দেয়ার জন্যেই তিনি একদিনের তরে রিকশাওয়ালা বনেন। দাদাজীকে নামিয়ে আবার দাদুকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরেন! আমরা নাতিরা সুযোগ পেলেই দাদুকে ক্ষেপাই! দাদুও কম জান না! তিনি ছদ্মকোপ দেখিয়ে বলেন, দেখবো তোরা কী করিস!

আরও মজার ব্যাপার হলো, মাঝেমধ্যে 'বুড়ি' আম্মাজান তার নাতিকে সহিস বানিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মাদরাসায় চলে আসেন। তাও দিনের আলোয় নয়, রাতের আঁধারে! চুপি চুপি! হুযূরের থাকার কামরাটা ছিলো মাদরাসার এক কোণে। রাস্তার পাশেই। বাহির থেকে এসে চট করে ঢুকে পড়া যেতো। কেউ দেখে ফেলার আগেই। সেটা হতো সাধারণত সোমবার কি মঙ্গলবার রাতে! হুযূর যেদিন বিকেলে বাজারে যেতেন! আমরা বুঝে যেতাম আজ কুছ 'গড়বড়' হোগা!

মাগরিবের আগে হুযূর হাসতে হাসতে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে জামাআত ধরতেন। মসজিদের দরজায় রেখে যেতেন সদাইপত্র! দুষ্ট ছেলের দল নামায বাদ দিয়ে সদলবলে হাজির হতো সদ্য করা 'মার্কেটিং' এর চারপাশে! বুড়িপ্রেমিকার জন্যে শাড়িগহনা কী কী কেনা হয়েছে দেখতে হবে! ঝোলা খোলার পর সবাই হতাশ! কোথায় কসমেটিকস! এ তো দু'টাকার ছোলা-বুট। পাঁচ টাকার বাদাম। দুই খিলি মিষ্টি জর্দা দিয়ে বানানো পান। সাকুল্যে এই!

একবার ব্যাগ খুলে আমরা ভীষণ অবাক! ভেতরে একটা বেড়ালছানা! হুযূর কার কাছ থেকে যেন এনেছেন। খবর নিয়ে জেনেছি, বাড়ির বেড়ালটা মারা গেছে। বুড়িমা বেড়াল বড় বেশি পছন্দ করেন। কোলে করে খাওয়ান। গোসল করিয়ে দেন। তাই নতুন আরেকটা বেড়ালের ব্যবস্থা। আরেকবার ব্যাগ খুলে দেখি হাঁসের ছানা! বুড়িমার আরেক প্রিয় জিনিস!

তখন না বুঝলেও এখন বুঝি, উপহার শুধু দাম দিয়ে কিনলেই হয় না, মন দিয়ে কিনতে হয়। হোক না সেটা সামান্য বেড়ালছানা! হাঁসের ছানা! দু'টাকার বুট!

বিকেলের বাজার করা দেখেই আমরা বুঝে নিতাম, 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'। তক্কে তক্কে থাকতাম! কখন রিকশা আসে। একজনকে পাহারায় বসিয়ে রাখতাম দরজার কাছটিতে। প্রায়ই দেখা যেতো আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পর সেই অচিনপুরীর রিকশা এসে কূলে এসে ভিড়েছে! অকর্মন্য পাহারাদার বদলে দেয়া হলো। তাগড়া যোয়ান দেখে একজনকে ঠিক করা হলো। যত রাতই হোক সে জেগে থাকবে। আমরা আজ আম্মাজানকে আপ্যায়ন করবো। মোরগ বিকেলেই কেনা শেষ। হুযূরকে বাজারে যেতে দেখেই পিছু পিছু গিয়েছে একজন বাজার করতে। সুন্দর দেখে একজোড়া চীনা হাঁসের বাচ্চা আরও এক সপ্তাহ আগে আনিয়ে রাখা হয়েছে! সেই সুদূর গ্রাম থেকে। আমরা খাদেম (বাবুর্চি) সাহেবকে বলে কয়ে রাজি করিয়ে রান্নাবান্না সেরে রেখেছি!

অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্যের শেষসীমায় তখন আম্মাজান এলেন। কামরার দরজা বন্ধ হতেই, আমরা খাবার-দাবারসহ হাজির হলাম। চুপিচুপি। হাঁসের ছানা দু'টো ঝামেলা করছিল। তবুও কী আর করা! সবকিছু গুছিয়ে রেখে দৌড়ে পালিয়ে এলাম। আসার আগে দরজায় মৃদু টোকা! একটু পর দরজা খুলল! আমরা দূর থেকে দেখলাম, হারিকেনের আলোতে হুযূর অবাক হয়ে টিফিন ক্যারিয়ারের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাসের ছানা দেখে দু'চোখ যেন ছানাবড়া! এতক্ষণে আমাদের লিখে রাখা চিরকুটের উপর নজর পড়লো–

-আম্মাজান! আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য মেহমানদারী আর ছোট্ট উপহার! আশা করি গ্রহণ করবেন! ভীষণ খুশি হবো!

এই বুড়িমার প্রতি আমাদের সবারই কেমন যেন শ্রদ্ধা জন্ম নিয়েছিল। অদেখা এডোলেসেন্স লাভ? অথবা প্লেটোনিক ইন্টেলেকচুয়াল এফেয়ার? উঁহু কোনটাই নয়। এসব কিছু আমাদের মহলে কল্পনাই করা যায় না। আর বুড়িমা আসলেই বুড়িমা!

আমরা ফারেগ হওয়ার কয়েক বছরের মাথায় হুযূর ইন্তেকাল করেছেন। খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, বুড়িমা শোকে পাথর হয়ে গেছেন! ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। তার সাথে কখনো কথা হয়নি। দেখা তো দূরের কথা! তবুও স্বামীর প্রতি তার ব্যাকুল ও অভিনব (আগ্রাসী?) ভালোবাসা আমাদের কচিমনে ভীষণ রেখাপাত করেছিল। বেশ কয়েক বছর আগে, আমরা কয়েকজন মিলে গিয়েছিলাম বুড়িমার কাছে। প্রত্যন্ত গ্রামের এক বাড়িতে। সামান্য কিছু হাদিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা একজনকে বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছি। দেখা করার বা দেখা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমরা গিয়েছিলাম বিবেকের তাকিদে! কিশোর বেলার শ্রদ্ধামাখা ভালোলাগার সলতে উস্কে দিতে! একজন অসহায় বৃদ্ধার জন্যে মনের কোনে জেগে ওঠা কষ্টকে প্রশমিত করতে!

লেখক : পরিচালক, মারকাযু তারতীলিল কুরআন
(নুরানী কারিয়ানা ও মুয়াল্লিমাহ ট্রেনিং সেন্টার)
ঘাটারচর, ওয়াশপুর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

এইচ এম শামসুদ্দীন
সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা

২১০ প্রশ্ন : আমার ব্যবসা থেকে খরচাদি বাদে উদ্বৃত্ত টাকা পরবর্তিতে বড় কোন একটি বিনিয়োগের জন্য জমা করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়িক কাজে অথবা কোন বড় বাড়ি করার জন্য। বিনিয়োগের সুযোগ আসার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত টাকা আমি আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকে এফ.ডি.আর করে রাখি। যা দুই-এক বছর পর ভাঙ্গিয়ে মূল টাকা বিনিয়োগ করি এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় মুনাফার টাকা আলাদা একটি অ্যাকাউন্টে রেখে দেই। যা গরীবদের মাঝে প্রয়োজনমত বিতরণ করা হয় এবং অতীতে এ ধরনের টাকা দিয়ে জনকল্যাণার্থে রাস্তা তৈরিতে এবং মাদরাসার বাথরুম তৈরিতে খরচ করা হয়েছে।

এছাড়া সরকারি, আধা সরকারি সংস্থার সাথে ব্যবসা করতে হলে এবং কোন লাইসেন্স নিতে হলে সেখানেও কিছু টাকা যামানত অত্যাবশ্যক হয়। উক্ত যামানতে নগদ অর্থ না দিয়ে এফ.ডি.আর আকারে জমা করা হয় এবং মেয়াদান্তে তাতে কিছু টাকা মুনাফা আসে যা পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে খরচ করি।

আমার জানার বিষয় হল, এই পদ্ধতি ঠিক আছে কিনা? ঠিক না হলে কোন সঠিক পথ আছে কিনা?

উল্লেখ্য, উক্ত এফ.ডি.আর ভাঙ্গানোর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত টাকার নিয়মিত যাকাত দিয়ে থাকি এবং আমি নিজে ব্যবসায়িক অথবা কোন বিনিয়োগের কাজে ব্যাংক থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করি না।

উত্তর : ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করা বা সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা রাখার অর্থ হল, ব্যাংকে টাকা বিনিয়োগ করা। আর যারা সুদী কারবারে জড়িত তাদের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করা জায়েয নেই। আমাদের জানামতে বাংলাদেশে কোন ব্যাংক সম্পূর্ণ সুদমুক্ত নয়। কাজেই আপনার ব্যবসা থেকে খরচাদি বাদে অতিরিক্ত টাকা বড় কোন বিনিয়োগের জন্য কোন ব্যাংকেই এফ.ডি.আর করে রাখা জায়েয নেই। তেমনিভাবে সরকারি, আধা সরকারি সংস্থার সাথে ব্যবসা করতে গিয়ে বা লাইসেন্স নিতে গিয়ে যামানত রাখার ক্ষেত্রে যেহেতু নগদ অর্থ রাখারও অবকাশ রয়েছে, তাই আপনার জন্য এখানেও যামানতের জন্য টাকা এফ.ডি.আর আকারে রাখা জায়েয নেই। এখন আপনার করণীয় হল, ভবিষ্যতে আপনার টাকা কোন ব্যাংকে এফ.ডি.আর আকারে অথবা সুদ আসে এমন কোন খাতে না রাখা। আর অতীতের মুনাফার টাকা আপনার হাতে থাকলে তা জনকল্যাণমূলক কাজ তথা রাস্তা তৈরির কাজে বা মাদরাসার বাথরুম তৈরির কাজে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া খরচ করে দেয়া।

আপনার জন্য সহীহ পদ্ধতি এই হতে পারে যে, আপনার ব্যবসার আয়ের টাকা এফ.ডি.আর আকারে না রেখে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রাখুন। আর যামানতের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ যামানত রাখুন। (সূরা বাকারা- ২৭৫-২৭৯, সূরা আলে ইমরান- ১৩০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১২০৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২০৬৯০, ফাতাওয়া শামী ৫/৯৯, ৬/৩৮৫, ইসলাম আওর জাদীদ মা‘আশী মাসাইল ৫/২১২-২১৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৩/৩৪৪, ফাতাওয়া উসমানী ৩/২৮২, মুহাক্কাক ওয়া মুদাল্লাল জাদীদ মাসাইল; পৃষ্ঠা ৩২৮)

এইচ এম শামসুদ্দীন
সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা

২১১ প্রশ্ন : ব্যবসার আয়ের টাকা এফ.ডি.আর না করে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রাখার ব্যাপারে যে ফয়সালা শরীয়ত কর্তৃক দেয়া হয়েছে, তাতে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলে ব্যাংক ঐ টাকা দিয়ে ঠিকই ব্যবসা করবে। তাতে বড়লোককে আরো বড় হওয়ার সহায়তা করা হলো কিনা? বিষয়টি জানানোর আবেদন করছি।

উত্তর : যথাসম্ভব ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা থেকে দূরে থাকা উচিত। তবে নিজের অর্থ-সম্পদ ও জান-মাল হেফাযতের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে রাখার বিশেষ প্রয়োজন হলে উলামায়ে কেরাম কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কারণ এ খাতে সুদ আসে না এবং নিয়ম অনুযায়ী এটা সুদী বিনিয়োগ নয়। ব্যাংকের কাছে সেই টাকা ঋণ হিসেবে থাকে। হিসাবধারী যখন ইচ্ছা সেই টাকা উঠাতে পারে; ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চাওয়া মাত্র টাকা দিতে বাধ্য থাকে। সেই টাকা হিসাবধারীর পক্ষ থেকে ব্যবসা করার জন্য প্রদত্ত নয়। তারা সেই টাকা সুদী ব্যবসা ছাড়া যে কোন কাজে ব্যবহার করতে পারে। আর যদি তারা সেই টাকা দিয়ে সুদী ব্যবসা করেও থাকে তাহলে তার দায় তাদের উপরই বর্তাবে; হিসাবধারী এর জন্য দায়ী হবে না। আর তাদেরকে সুদী কাজে সহায়তা করার নিয়ত না করলে তাতে হিসাবধারীর কোন গুনাহও হবে না। (সূরা বাকারা- ২৭৫, ২৭৮, ২৭৯, সূরা আলে ইমরান- ১৩০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১২০৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২০৬৯০, আহকামুল কুরআন [মুফতী শফী রহ.] ৩/৭৭-৭৮, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ১০২)

খান আখতারুজ্জামান
বসুন্ধরা, ঢাকা

২১২ প্রশ্ন : পিতার পূর্বে সন্তান মারা গেলে সন্তানের ওয়ারিসরা বাবার (দাদার) ইন্তিকালের পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির কোন অংশ পাবে কিনা?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী পিতার জীবদ্দশায় কোন সন্তান মারা গেলে অতঃপর পিতার মৃত্যুর সময় তার কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকলে পিতার পূর্বে মৃত সন্তানের সন্তান তথা নাতিরা দাদার ত্যাজ্য সম্পত্তির কোন অংশ পাবে না এবং নাতিদের জন্য ইসলামের এই বিধানকে উপেক্ষা করে মীরাসের দাবী করাও জায়েয হবে না। (আস-সিরাজী ফিল মীরাস; পৃষ্ঠা ৩২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৬/৪৫১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩০/২৫১)

মুহসিন আহমাদ
উত্তরা, সেকশন-৭, ঢাকা

২১৩ প্রশ্ন : বর্তমানে বিদেশের অনেক মসজিদে দোতলা, তিনতলায় খতীব সাহেবের খুতবা ও বয়ান সরাসরি দেখার জন্য লাইভ স্ক্রিনের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়। এখানে ভিডিও সংরক্ষণ করা না হলেও সংরক্ষণের সুযোগ থাকে।

জানার বিষয় হল, এ কাজটি কতটুকু শরীয়তসম্মত? আমাদের দেশের

প্রেক্ষাপটে মসজিদে এমন যন্ত্র ব্যবহার করা যুগোপযোগী কিনা?

উত্তর : সাধারণভাবে লাইভ স্ক্রিনের মাধ্যমে সংরক্ষণ না করার সূরতে সম্প্রচার জায়েয হলেও প্রশ্নোক্ত সুরতে কয়েকটি কারণে তা নাজায়েয-

১. মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর। সুতরাং এর আদব বজায় রাখা একান্ত অপরিহার্য। খতীবের বয়ান ও খুতবার সময় খতীবকে দেখা এমন কোন প্রয়োজন নয়, যার জন্য দোতলায় বা তৃতীয় তলায় লাইভ স্ক্রিনে সম্প্রচার করতে হবে। আর মসজিদে অপ্রয়োজনীয়-অনর্থক কাজের অবকাশ নেই।

২. লাইভ স্ক্রিনে সম্প্রচার সংরক্ষণ না করার সুরতে জায়েয হলেও তাতে সংরক্ষণের সুযোগ থাকায় কখনো সংরক্ষণের আশঙ্কা রয়েছে, যা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। আর শরীয়তের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল, যখন কোন বৈধ কাজ এমন হয় যা করতে গিয়ে হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে সে ক্ষেত্রে হারামের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী বৈধ কাজটিও অবৈধ হয়ে যায়।

৩. সাধারণত এ জাতীয় যন্ত্র নাজায়েয কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই জায়েয সুরতও নাজায়েয সুরতের সাথে সাদৃশ্য রাখার দ্বারা হারাম-হালালের মাঝে সংমিশ্রণ তৈরি হয় এবং এর সাথে অন্যান্য অনৈসলামিক কার্যকলাপও যুক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

হাদীস শরীফে বহু বিষয় হারামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে বা হারামের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী হওয়ার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। (সূরা বাকারা- ২১৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২, ৫৯৫১, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৫১৮, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৯৯২, আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ; পৃষ্ঠা ১০৮, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ৩০১, আলাতে জাদীদা কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা ১৪০, ৩৫৭, চান্দ আহাম আসরী মাসাইল; পৃষ্ঠা ৩৫৭)

হাফেয মুহাম্মাদ কাযী রঈস তানবীর
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

২১৪ প্রশ্ন : চিংড়ি মাছ খাওয়ার হুকুম কি? উলামায়ে কেরামের উক্তিসহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : 'চিংড়ি' খাওয়া হালাল না হারাম এ মাসআলার মূল ভিত্তি হল 'চিংড়ি' মাছ হওয়া বা না হওয়ার উপর। মাছ হলে অন্য সকল মাছের ন্যায় 'চিংড়ি'ও হালাল হবে। আর মাছ না হলে অন্য সকল হারাম প্রাণীর ন্যায় হারাম হবে।

আভিধানিক ও সামাজিক পরিভাষাই কোন জিনিসের মৌলিক পরিচয় জানার মূল ভিত্তি। 'চিংড়ি' আভিধানিক ও সামাজিক পরিভাষায় মূলত একটি মাছ। যেমন ই'লাউস সুনানে মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন,

وبالجملة فكل ما كان من جنس السمك لغة وعرفا فهو حلال بلا خلاف كالسقنقور والروبيان ونحوهما.

অর্থ : মোটকথা আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে যে সকল প্রাণী মাছের অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হালাল হবে। যেমন ... চিংড়ি ইত্যাদি। (ই'লাউস সুনান ১৭/১৮৮)

ভাষাবিদ উলামায়ে কেরামের উক্তিসমূহ

১. মুরতাযা যুবাইদী রহ. বলেন,

الاربيان سمك بيض كالدود.

অর্থ : 'চিংড়ি' সাদা মাছ যা দেখতে পোকার ন্যায়। (তাজুল উরূস ৩৮/১২১)

২. মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইয়াকূব রহ. বলেন,

الاربيان سمك كالدود.

অর্থ : 'চিংড়ি' পোকার ন্যায় দেখতে একটি মাছ। (আল-কামূসুল মুহীত ১/১২৮৬)

৩. ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ আল-জাওহারী রহ. বলেন,

الاربيان بكسر الهمزة ضرب سمك يكون بالبصرة.

অর্থ : 'চিংড়ি' মাছেরই একটি প্রকার যা বসরায় পাওয়া যায়। (আস-সিহাহ ৬/২৩৫১)

৪. আল্লামা দিময়ারী রহ. বলেন,

الروبيات هو سمك صغير جدا احمر.

অর্থ : 'চিংড়ি' খুবই ছোট একটি মাছ। (হায়াতুল হায়াওয়ান ১/৫১৪)

৫. আল-মুনজিদে উল্লেখ করা হয়েছে,

هو سمك يشبه هيئة البرغوث.

অর্থ : 'চিংড়ি' একটি মাছ যা দেখতে বুরগুসের (পাখা বিহীন এক ধরনের পোকার) ন্যায়।

মুফতিয়ানে কেরামের ফাতাওয়া

১. মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন, মোটকথা আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে যে সকল প্রাণী মাছের অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হালাল হবে। যেমন ... চিংড়ি ইত্যাদি। (ই'লাউস সুনান ১৭/১৮৮)

২. মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুবী রহ. বলেছেন, 'চিংড়ি' খাওয়া হালাল। কেননা এটা মাছের একটা প্রকার। আর সকল মাছই হালাল। যারা এটাকে হারাম বলেছেন, তারা মূলত এটাকে মাছের প্রকার থেকে বের করে হারাম বলেছেন। কিন্তু এটা মূলত মাছ। (মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া ২/২৯৭)

৩. হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেন, আল্লামা দিময়ারী হায়াতুল হায়াওয়ানে উল্লেখ করেছেন, الروبيان هو سمك صغير جدا. । তার এই তাহকীক গ্রহণ না করার কোন যুক্তি নেই। সুতরাং তার এই তাহকীক দ্বারা 'চিংড়ি' হালাল হওয়া বুঝা যায়। ...আমার নিকট এখন পর্যন্ত 'চিংড়ি' মাছ হওয়াটাই নিশ্চিত। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১০৩-১০৪)

৪. মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা. 'চিংড়ি' সম্পর্কে এক দীর্ঘ ফাতওয়ায় বিস্তারিত আলোচনার একপর্যায়ে বলেন, সহীহ এবং তাহকীকী সিদ্ধান্ত হল 'চিংড়ি' মাছেরই একটি প্রকার এবং তা খাওয়া সম্পূর্ণ হালাল। (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া)

৫. ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দের এক ফাতওয়ায় উল্লেখ রয়েছে, পানিতে বসবাসকারী 'চিংড়ি' অন্যান্য মাছের ন্যায় একটি মাছ। (ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/৪৬৩)

উল্লিখিত ভাষাবিদ উলামায়ে কেরামের উক্তি ও বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের ফাতাওয়াসমূহ দ্বারা খুব সহজেই প্রমাণিত হয় যে, 'চিংড়ি' অন্য সকল মাছের ন্যায় একটি মাছ। সে হিসেবে অন্য সকল মাছের ন্যায় 'চিংড়ি' খাওয়াও হালাল হবে।

অতএব কোন ব্যক্তির জন্য একথা বলার সুযোগ নেই যে, 'চিংড়ি মাছ খাওয়া মাকরূহে তানযীহী। আর মাকরূহে তানযীহী বারবার করার দ্বারা তা হারামে পরিণত হয়। সুতরাং চিংড়ি মাছ একাধিকবার খেলে হারাম খাওয়া হবে।' তাছাড়া কোন কোন আলেম 'চিংড়ি'র মাছ হওয়াকে অস্বীকার করে হারাম ফাতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু মাকরূহে তানযীহী কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। (ই'লাউস সুনান ১৭/১৮৮, মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া ২/২৯৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১০৩-১০৪)

আল-আমীন
মোমেনশাহী

২১৫ প্রশ্ন : চক্ষু বা কিডনি দান করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : মানব দেহের কোন অঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা স্বেচ্ছায় দান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। চাই সে

বিক্রি বা দান বিক্রয়কারী বা দানকারীর জীবদ্দশায় সংঘটিত হোক কিংবা তার মৃত্যুর পর সংঘটিত হোক।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্মানিত করেছেন। জীবদ্দশায় মানুষ যেমন সম্মানিত, তদ্রূপ মৃত্যুর পরও মানুষ আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত। এর কারণ হল, মানুষের নিকট তার দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তা'আলার দেয়া গুরুত্বপূর্ণ আমানত। এজন্য কারো এ অধিকার নেই যে, সে ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করে দিবে। তেমনিভাবে ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করারও তার অধিকার নেই। এজন্যই ইসলামে আত্মহত্যাকে হারাম করা হয়েছে এবং আত্মহত্যাকারীর ব্যাপারে কঠোর শাস্তির হুশিয়ারী এসেছে। হাদীসে এসেছে,

عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عيله وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.

অর্থ : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে এবং জাহান্নামের মধ্যে সে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে। এভাবে সে চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অবস্থান করে উক্ত বিষ পান করতে থাকবে। এভাবে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে সর্বদা পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হতে থাকবে। এভাবে সে চিরকাল অবস্থান করবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০১ [ইফাবা])

যখন মানুষ নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিকই নয়, তখন এগুলো বিক্রি বা দান করার ক্ষমতাই তার নেই। কেউ যদি জীবদ্দশায় কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করার অসিয়তও করে যায়, তবে তার সে অসিয়ত শরীয়তের দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রাণ ধারণে অনোন্যপায় হয়ে পড়লে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে শরীয়তে মৃতপ্রাণী এবং হারাম বস্তু ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এমন সঙ্কটময় মুহূর্তেও মৃত কিংবা জীবিত মানুষের গোশত ভক্ষণ করার বা কোন ব্যক্তির নিজ দেহের কোন অংশ ভক্ষণের অনুমতি শরীয়ত কাউকে প্রদান করেনি। জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো দূরের কথা, শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত মানুষের হাড়, চামড়া, চুলসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করা হারাম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করাটা বাহ্য দৃষ্টিতে বিরাট মানবসেবা মনে হলেও এর বহুবিধ ক্ষতি রয়েছে।

শরীয়তের অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল, কোন কাজে লাভ-ক্ষতি উভয়টির আশঙ্কা থাকলে সে কাজ বর্জন করা জরুরী। অতএব মানুষের প্রাণ যেমন সম্মানিত, তেমনি সম্মানিত মানবদেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ কারণে আত্মহত্যা যেমন নাজায়েয ও হারাম, তদ্রূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করা কিংবা ক্রয়-বিক্রয় করা সবই শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম।

উল্লেখ্য, প্রয়োজনে একজনের রক্ত অন্যজনকে দান করার শরঈ অনুমতি রয়েছে। ফিকহবিদগণ রক্তকে বুকের দুধের সঙ্গে তুলনা করেছেনে। তাই দুধ যেমন আপন-পর সকল শিশুকেই পান করানো যায়, তেমনি কারো প্রয়োজনে রক্তও দেয়া জায়েয হবে। কিন্তু বিক্রয় করার অনুমতি দুধ এবং রক্ত কোনটার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৭০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৩৮, ৩৫৪, শরহু সিয়ারিল কাবীর ৩/২৬৯, বাদায়িউস সানায়ি' ৫/১৩২, ফাতাওয়াল মারযা ওয়াত-তিব ১/৩৩৮, ফিকহুল মু'আমালাত ১/৯৫, জাওয়হিরুল ফিকহ ৭/৫৩)

মশিউর রহমান পারভেজ
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

২১৬ প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব বর্তমানে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে কর্মরত আছেন। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। জানার বিষয় হল, ইমাম থাকাবস্থায় তিনি (ইমাম সাহেব) ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে কাজ করতে পারবেন কিনা? সঠিক মাসআলা জানিয়ে আমাদের সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনার সহযোগিতা করায় আপনাদের মর্জি হয়।

উত্তর : আমাদের জানামতে বাংলাদেশে শরীয়তসম্মত কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী নেই। 'ইসলামী' নাম ব্যবহারকারী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলোও বিশেষ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুদী কারবার ও জুয়া ইত্যাদি নাজায়েয কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এবং আল-আরাফা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এ.জেড.এম শামসুল আলম সাহেবের বীমা সম্পর্কিত লেখা থেকেও এটাই প্রতীয়মান হয়। তিনি লিখেছেন, 'ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাগণ তাদের ব্যবসা সুদী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলোকেই মূলত দিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে সুদী ব্যাংকসমূহের কিছু কিছু ব্যবসা ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলো পাচ্ছে। তবে যে শর্তে এবং যে পদ্ধতিতে অন্যান্য সুদী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী সুদী ব্যাংকের ক্লায়েন্টদের ব্যবসা পেয়ে থাকে।' (সূত্র : ইসলামী ইন্স্যুরেন্স (তাকাফুল); পৃষ্ঠা ১৪, লেখক : এ.জেড.এম শামসুল আলম, প্রকাশনা : মাম্মী প্রকাশনী, ১২-১৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ : ২০০১ইং)

কাজেই উক্ত ইমাম সাহেবের জন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্সে চাকরি করা বৈধ নয়। চাই তিনি ইমাম থাকাবস্থায় সেখানে চাকরি করেন কিংবা ইমামতি থেকে অব্যাহতি নিয়ে চাকরি করেন। সুতরাং লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দেয়া ইমাম সাহেবের জন্য জরুরী। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৬/১৯৫-১৯৬, ফিকহুল মু'আমালাত ১/১৭৬-১৭৭)

মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

২১৭ প্রশ্ন : (ক) কোন জায়গায় সমবেত হয়ে যৌথ কণ্ঠে প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল জায়েয আছে কি?

(খ) মীলাদের মাঝখানে হঠাৎ কিয়াম করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?

(গ) মীলাদের প্রচলন বা সূচনা কবে থেকে হয় এবং এর আবিষ্কারক কে?

উত্তর : (ক) বর্তমানে প্রথা হিসেবে যে সব মীলাদ মাহফিল কায়েম করা হয় এবং সেখানে দীন সম্পর্কে অজ্ঞদের রচিত কবিতা এবং গর্হিত ও মনগড়া কথা সুর করে পড়া হয়, উপরন্তু প্রচলিত এ পন্থায় মীলাদ পড়াকে জরুরী কিংবা বেশি সওয়াবের কাজ মনে করা হয়– তা সুন্নাত পরিপন্থী এবং বিদ'আত। প্রচলিত মীলাদ-মজলিস নানারকম বিদ'আত ও নাজায়েয কর্মকাণ্ডের আখড়া। তাই তা নাজায়েয ও হারাম।

সহীহ পদ্ধতি অবলম্বন করে মীলাদ পড়লে সেটা জায়েয এবং মুস্তাহাব। মীলাদের সহীহ পদ্ধতি হল, প্রচলিত মীলাদের সাথে মিল না রেখে, আগে

থেকেই দিন-তারিখ, সময় নির্দিষ্ট না করে ঘটনাক্রমে কিছুলোক একত্রিত হয়ে গেল বা অন্য কোন বৈধ প্রয়োজন বা বয়ান ও ওয়ায মাহফিলের জন্য এ লোকদেরকে একত্রিত করা হয়েছিল, তখন উপস্থিত লোকদের সামনে মৌখিকভাবে হোক বা কোন সহীহ কিতাব থেকে পড়ে হোক– হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত এবং তার অভ্যাস, চরিত, অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি আলোচনা করা। প্রয়োজনবোধে আলোচনার মধ্যে শরীয়তের বিধানও বলে দেয়া। অথবা মূলত ওয়ায-নসীহতের জন্যই লোকদের একত্র করা হয়েছিল, সে ওয়াযের মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ও জীবনকাহিনীও আলোচনা করা হল।

আরেকটি তরীকা হল, মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে একা একা বা ডাকাডাকি ছাড়া একাধিক লোকজন একসাথে মিলে গেলে সকলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। একাধিক লোক হলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আওয়াজে নিজস্ব ধারায় দুরূদ পড়বে। ইচ্ছা ছাড়াই অন্যের সাথে তাল মিলে গেলে দোষণীয় নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই সহীহ উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ভুল বা বানোয়াট দুরূদ পড়বে না, তাওয়ালুদ করবে না, কিয়াম করবে না। কেননা এসবের কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। এরপর সুযোগ হলে উক্ত মজলিসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন সুন্নাতেরও আলোচনা করবে।

(খ) দুরূদ শরীফ দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় পড়া যায়। কিন্তু মনগড়া নিয়মে আগে-পরে বসে মাঝখানে কিছু সময় দাঁড়িয়ে কিয়াম করা সুস্পষ্ট বিদ'আত। আর যদি কিয়াম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে উপস্থিত হওয়ার আকীদার সাথে করা হয়, তাহলে এ বিদ'আত কাজের সাথে শিরকের আশঙ্কাও যুক্ত হবে।

(গ) হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনের সময়ে প্রচলিত পন্থার মীলাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে সুদীর্ঘ ছয়'শ বছর পর্যন্ত এ মীলাদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মীলাদ সমর্থক এবং মীলাদ বিরোধী সকলেই একমত। সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে মসুল অঞ্চলে সর্বপ্রথম উমর ইবনে মুহাম্মাদ মসুলী নামক এক ব্যক্তি বর্তমানের প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কার করে। আর সেটা ছিল মসুলের স্বেচ্ছাচারী শাসকের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তার গদি টিকিয়ে রাখার জন্য। কাজেই প্রচলিত মীলাদ বিদ'আত।

তবে সঠিক পদ্ধতিতে মীলাদ পড়লে তা বিদ'আত নয়; বরং সওয়াবের কাজ। মীলাদের সঠিক পদ্ধতি প্রথম প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৬০৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৫৫৮৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৬/৩২৬, আল-মাদখাল লিইবনিল হাজ্জ ২/৩, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রশাদ ১/৩৬২, ৩৬৫, শাজারাতুয যাহাব ৪/২৪১, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ৩/৫৩৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/২৮২, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া ১/১৮১-১৮৮, ফাতাওয়া হাদীসিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১১২, ফাতাওয়া কাযীখান ১/৩৩৪, ইমদাদুল মুফতীন ২/১৭২, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৮৩, তারীখে মীলাদ; পৃষ্ঠা ১৩, ১৪, ইসলাহুর রুসূম; পৃষ্ঠা ৭৯)

কাযী রঈস তানবীর
উত্তরা, সেক্টর-১৪, ঢাকা

২১৮ প্রশ্ন : খানা খাওয়ার সময় বসার সুন্নাত তরীকা কী? মক্তবের বাচ্চাদেরকে বসার আদব শিরোনামে যে পদ্ধতি শেখানো হয়– যেমন ... দুই হাঁটু উঠাইয়া খাওয়ার সময়– এটাই কি সুন্নাত তরীকা? দলীল-প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : খানা খাওয়ার সময় টেক লাগিয়ে, হেলান দিয়ে অথবা এমনভাবে বসে খানা খাওয়া অনুচিত যাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়; বরং এমনভাবে বসে খানা খাওয়া উচিত যাতে বিনয়, আবদিয়্যাত (দাসত্ব) ও খানার প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ পায়। এ হিসেবে খানা খাওয়ার সময় বসার আদব বা মুস্তাহাব তরীকা হল,

(ক) উভয় হাঁটু বিছিয়ে বসা। অর্থাৎ নামাযে বসার ন্যায় বসে সামান্য সম্মুখপানে ঝুঁকে আহার করা।

(খ) এক হাঁটু উঠিয়ে এবং অপর হাঁটু বিছিয়ে বসা। অর্থাৎ ডান হাঁটু উঠিয়ে এবং বাম হাঁটু বিছিয়ে বসা।

(গ) আর প্রয়োজনে চারজানু হয়ে (আসন করে) বসাও জায়েয আছে। তবে প্রথম দুই প্রকারের মধ্যে যে পরিমাণ বিনয় ও আবদিয়্যাত প্রকাশ পায় এ পরিমাণ বিনয় ও আবদিয়্যাত চারজানু হয়ে বসার মধ্যে পাওয়া যায় না। এজন্য উভয় হাঁটু বিছিয়ে অথবা এক হাঁটু উঠিয়ে এবং অপর হাঁটু বিছিয়ে বসার অভ্যাস করা ভালো। তবে কেউ যদি এভাবে বসতে না পারে তাহলে তার জন্য চারজানু হয়ে বসতে কোন সমস্যা নেই। লোকসমাজে প্রচলিত আছে যে, চারজানু হয়ে বসা নাজায়েয বা মাকরূহ– এটা সঠিক নয়।

আর খানা খাওয়ার সময় বসার সুন্নাত তরীকা হিসেবে যেটা প্রসিদ্ধ আছে এবং মকতবের বাচ্চাদেরকে বসার আদব শিরোনামে যে পদ্ধতি শেখানো হয় যে,– ... 'দুই হাঁটু উঠাইয়া খাওয়ার সময়' আরেকটু স্পষ্ট করে বললে, 'দুই হাঁটু উঠিয়ে এবং পদযুগলে ভর করে বসা'– এটা খানা খাওয়ার সময় বসার আদব বা সুন্নাত তরীকা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় না, যার দ্বারা 'দুই হাঁটু উঠিয়ে এবং পদযুগলে ভর করে বসা' খানা খাওয়ার সুন্নাত বা আদব সাব্যস্ত হয়। যারা একে খানা খাওয়ার সময় বসার সুন্নাত তরীকা হিসেবে বলেন, তারা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আনাস রাযি. এর হাদীস– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইক'আ' অবস্থায় খেজুর খেতে দেখেছি। (হা.নং ২০৪৪)'– দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন।

কিন্তু উক্ত হাদীস দ্বারা খানা খাওয়ার সময় 'দুই হাঁটু উঠিয়ে এবং পদযুগলে ভর করে বসা' সুন্নাত সাব্যস্ত হয় না। কারণ উক্ত হাদীসে নবীজীর বসার পদ্ধতি 'ইক'আ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ 'নিতম্ব ভূমিতে রেখে উভয় হাঁটু সামনের দিকে খাড়া করে রেখে বসা'। এখানে নিতম্ব ভূমিতে রেখে উভয় হাঁটু খাড়া রাখার কথা আছে; 'দুই হাঁটু উঠিয়ে পদযুগলে ভর করে বসা'র কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাত্র একবারের আমল যা সুন্নাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

সুতরাং খানার খাওয়ার সময় বসার সুন্নাত তরীকা হিসেবে যে পদ্ধতি প্রসিদ্ধ আছে এবং মক্তবের বাচ্চাদেরকে বসার আদব শিরোনামে যে পদ্ধতি শেখানো হয়, ... 'দুই হাঁটু উঠাইয়া খাওয়ার সময়' বা 'দুই হাঁটু উঠিয়ে এবং পদযুগলে ভর করে বসা' কথাটা সংশোধনযোগ্য। (সহীহ মুসলি; হা.নং ২০৪৪, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৩৯৮, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৭৭৩, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ১৫/২৭০, ফাতাওয়া শামী ৬/৭৫৬, মুখতারুস সিহাহ; পৃষ্ঠা ২৯৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/৪৮, ইসলাহী খুতুবাত ৫/১৮৫)

মূর্তি ও ভাবমূর্তি

উসামা যুলকিফিল

গেল বছরের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে গ্রিক দেবী থেমিসের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এ নিয়ে আবহাওয়া বেশ গরম। সচেতন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রত্যাশিত বিক্ষোভ-প্রতিবাদ আমাদের যেমন আশান্বিত করে তেমনি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের অসংলগ্ন প্রলাপ যুগপৎ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। তবে সব কিছুর পূর্বে দেবী থেমিসের বৃত্তান্তটা একটু কপচে নিই।

গ্রিক পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতকে টিটান দেব-দেবীর একজন ছিল থেমিস। প্রথমে থেমিস ছিল প্রাকৃতিক নিয়ম ও আইনের দেবী। প্রাকৃতিক নিয়মই হচ্ছে সুবিচারের প্রকাশ। তাই থেমিস হয়ে দাঁড়ালো ন্যায়বিচারের দেবী। অনুরূপভাবে খ্রিস্টীয় ১ম শতকে এসে রোমানরা ন্যায় বিচারের দেবীর নাম দেয় জাস্টিসিয়া বা লাস্টিসিয়া। খ্রিস্টীয় ২২ সালে রোমান মুদ্রায় দেবী জাস্টিসিয়ার মূর্তি অঙ্কিত হয়। ন্যায়বিচারের গ্রিক দেবী থেমিস যাকে রোমানরা বলতো জাস্টিসিয়া বা লাস্টিসিয়া। দেবী থেমিস বা জাস্টিসিয়ার মূর্তিটি একজন নারীর। তার ডান হাতে আছে একটি তরবারি। বাম হাতে একটি দাঁড়িপাল্লা। তার চোখ দু'টো ছিল খোলা।

যেহেতু দেবী থেমিস বা দেবী জাস্টিসিয়াকে কল্পনা করা হয়েছিল একজন নারী হিসেবে। তাই সুবিচারের নারী মূর্তির ভাস্কর্যকে বলা হলো লেডি জাস্টিস। অথচ সে সময় গোটা ইউরোপে কোন নারী বিচারপতির অস্তিত্ব ছিল না। তবু বিচারের প্রতীক হিসাবে নারীর ভাস্কর্যকে মেনে নেয়া হলো এবং তার এক হাতে ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা, অন্য হাতে শাস্তিদানের প্রতীক তরবারি দেয়া হলো। চোখ বেঁধে রাখার বিষয়টি প্রাচীন গ্রিস-রোমানে ছিল না। রোমান মুদ্রায় যে দেবী জাস্টিসিয়ার ছবি অঙ্কিত ছিল, তার ছিল খোলা চোখ– বাম হাতে ছিল দাঁড়িপাল্লা আর ডান হাতে ছিল তরবারি। এমনকি ১৯০২ সালে নির্মিত লন্ডনের ফৌজদারী আদালত ভবনের শীর্ষে স্থাপিত লেডি জাস্টিসের ব্রোঞ্জ মূর্তির চোখ খোলা রাখা হয়েছে। কবে থেকে চোখ বাঁধার প্রথা চালু হলো তা সুনির্দিষ্ট নয়। তবে যতদূর জানা যায় যে, ১৫৪৩ সালে সুইজারল্যান্ডের বার্নেতে স্থাপিত লেডি জাস্টিসের ভাস্কর্যের ছিল চোখ বাঁধা। ধারণা করা হয় যে ১৫ শতকের শেষ দিক থেকে চোখ বাঁধা থেমিস বা জাস্টিসিয়ার মূর্তি নির্মিত হতে থাকে। তারপর থেকে চোখ বাঁধাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় এবং বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব ছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার বিভিন্ন শহরের আদালত প্রাঙ্গণে লেডি জাস্টিসের চোখ বাঁধা মূর্তি স্থাপিত আছে।

এই হল থেমিসের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত। কিন্তু গত আটষট্টি বছর যাবত অবস্থানরত দাঁড়িপাল্লায় কী এমন ত্রুটি দেখা দিল যে, সেটার স্থানে দেবী মূর্তি স্থাপন করতে হল! সম্ভবত বিচারের বদলে অবিচারের বোঝা বইতে বইতে বেচারা ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই পতন ঘটবার আগেই দেবীর হাতে তুলে দেয়া হল– দেবী, এবার তুমি সামলাও!

দেবীর চোখে পট্টি বাঁধা। দেবীর পরনে আবার শাড়ি! এইটা বেশ কাজ হয়েছে! কারণ দেবীর প্রকৃত যে আলুলায়িত উগ্র রূপ; সে অবস্থা থাকলে যুবসমাজ না আবার দেবীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সেলফিতে মেতে ওঠে!

মামলাজট এ দেশের বিচারব্যবস্থার অন্যতম বড় সমস্যা। মামলাজটের চিত্র দেখুন, নিম্ন আদালতের সাতাশ লাখ মামলার জন্য বিচারক হল এক হাজার একশ (১১০০) জন। আর উচ্চ আদালতের প্রায় চার লাখ মামলার মধ্যে একমাত্র হাইকোর্ট বিভাগেই ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিন লাখ একষট্টি হাজার (৩,৬১,০০০) মামলা নিস্পত্তির অপেক্ষায়। এ বিভাগের মোট বিচারক সাতানব্বই (৯৭) জন।

সার্বিকভাবে গত পনের বছরে (২০১৫ পর্যন্ত) মামলা বৃদ্ধির সংখ্যা দুই লাখ চল্লিশ হাজার সাতশ আটান্ন (২,৪০,৭৫৮) টি। এর তুলনায় মোট বিচারকের সংখ্যা এই পনের বছরে ছাপ্পান্ন (৫৬) জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে মাত্র সাতানব্বই (৯৭) জন।

এই জট ছাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নাকি নেয়া হয়েছে। কিন্তু রোজ কিয়ামতের আগে এই জট ছাড়বে কিনা আল্লাহ মালুম! হয়তো এই বাস্তবতা বুঝতে পেরেই মামলা জট ছাড়ানোর উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেবীকে 'নিয়োগ' দেয়া হয়েছে। ব্যস, জট ছাড়ানোর দায়িত্ব এখন দেবীর কাঁধে। কাজেই 'ন্যায়ের দেবী' ন্যায় করিতে না পারিলে মনুষ্য সন্তানের কী দোষ!

তবে মদীনা সনদের কোন্ ধারা অনুযায়ী দেবী এই বঙ্গদেশে 'চান্স' পেলেন, জাতি সে ব্যাপারে ধোঁয়াশায় আছে।

আমাদের প্রধান বিচারপতি সাহেব ভিন্ ধর্মের মানুষ। বিচার ব্যবস্থার অব্যবস্থায় তার মনে হয়তো বড় খেদ। কিন্তু করার তো কিছু নেই। এখন দেব-দেবীর স্মরণে যদি কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়! এদিকে আবার নিজেদের দেব-দেবীদের যেহেতু কেবল লীলা-খেলার ইতিহাস; তাই গ্রিক দেবীর আমদানী! তেত্রিশ কোটির সঙ্গে আরেক 'পিস' বৃদ্ধি পেলে কি আর মহাভারত 'শুদ্ধ' হয়ে যাবে!

বিনা দোষে কারাবাস এ দেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এর ভিকটিমদের কপালে না জোটে বিচার আর না পান কোন ক্ষতিপূরণ। তারা এখন সরকারের ওপর গযবের দু'আ না করে সব 'দেবীর হাতে' বলে যেন দুঃখ চাপতে পারেন, তাই বোধ করি সরকারের এই মহানুভবতা!

মূর্তির পক্ষের লোকদের যুক্তি হচ্ছে, এটা মূর্তি নয়। বরং স্কাল্পচার বা ভাস্কর্য। মূর্তিকে শৈল্পিক রূপ দান করলেই সেটা নাকি ভাস্কর্য হয়ে যায়। অভিধানে কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে কোন তফাৎ দেখানো নেই। সুতরাং যে লাউ সে কদু। এই সব খোঁড়া যুক্তি দিয়ে তারা নিজেরাও হয়তো মনে মনে লজ্জা পান।

বেশ ক'বছর আগে যখন উত্তরায় হাজী ক্যাম্পের সামনে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপনের চেষ্টা চলছিল, তখন এর পক্ষের একজনের লেখা পড়েছিলাম। বিভিন্ন আজাইরা যুক্তি দিয়ে শেষে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছিলেন, শিল্প-সংস্কৃতির অগ্রযাত্রা এভাবে ব্যাহত হতে থাকলে নাকি আমাদের আবার প্রস্তরযুগে ফিরে যেতে হবে। মিথ্যা অপবাদ দেয়ার তোড় দেখুন! শিল্প-সংস্কৃতির 'ধ্বজাধারীরা' এখন আটাশ'শ বছর আগের প্রস্তরযুগে ফিরে গিয়ে সেখানকার সংস্কৃতি তুলে এনেছেন। হায় সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ!

অনেকে আবার এর পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে কোন্ কোন্ মুসলিম দেশে মূর্তি আছে, সেটার ফিরিস্তি দেন। সব মুসলিম

দেশের শহরে শহরেও যদি মূর্তি স্থাপিত হয়, তবেও কি ইসলামের বিধি-বিধান বদলাবে? ইসলামের বিধি-বিধান কিয়ামত পর্যন্ত অমোচনীয়, অলঙ্ঘ্য।

নব্বই ভাগ মুসলমানের এই দেশে বিচারালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দেবীমূর্তি স্থাপন অত্যন্ত দুঃখজনক ও হতাশার। যেখানে আজ পর্যন্ত কোন মুসলিম দেশে এই নজির কায়েম হয়নি; ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকার মত অমুসলিম দেশেও যখন লেডি জাস্টিসের স্থান হয়নি; সেখানে ওলি-আউলিয়ার দেশে, জাতীয় ঈদগাহের পাশে এই মূর্তি বহু প্রশ্নের জন্ম দেয়। ইসলাম মূর্তির বিরুদ্ধে; শিল্পের বিরুদ্ধে নয়। মূর্তি বিহীন ভাস্কর্য তৈরি করুন। মূর্তির ভাস্কর্য তৈরি করতে গেলে হাত-পা ছাড়া আর কী বানাবেন? তাই মূর্তিবিহীন ভাস্কর্য সংস্কৃতি চালু হলে আমরা এই অর্থহীন ব্যাপারটা থেকে মুক্ত হয়ে আরও বৈচিত্রময় এবং আরও নান্দনিক কিছু শিল্প পেতে পারতাম।

আমরা অতি দ্রুত আদালত প্রাঙ্গণ থেকে দেবীমূর্তির অপসারণ চাই। আশা করি সরকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। মূর্তি অপসারণ করে উদ্ধার করবেন নিজেদের ভাবমূর্তি!

লেখক : শিক্ষার্থী, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

(৫২ পৃষ্ঠার পর; কিশোর প্রতিভা)

আর সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আল-নাহিয়ান তো যেন ঘুমের ঘোরে বলেই ফেলেছেন, ট্রাম্পের এ আদেশ নির্দিষ্টভাবে কোন ধর্মকে লক্ষ্য করে জারি করা হয়নি। তিনি বলেছেন, মার্কিন প্রশাসনের নতুন সিদ্ধান্ত কোন নির্দিষ্ট ধর্মকে লক্ষ্য করে নেয়া হয়েছে বলাটা ভুল হবে। অথচ ট্রাম্পের প্রধান টার্গেটই হল ইসলাম।

এছাড়া সৌদি আরব, কুয়েত, কাতারসহ অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোও ছিল নীরব, নিশ্চুপ।

কিন্তু কেন? এমনটি হল কেন? হবেই বা কেন? মুসলিম অভিবাসী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের কর্ণধারগণ নীরব কেন? তারা কি চান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহস বাড়িয়ে নিষেধাজ্ঞার পালাটা তাদের উপর ফেলুক? তাছাড়া ঐ মুসলিম দেশের নাগরিকগণ কি তাদের কেউ নন?

মুসলমানগণ কি তাদের আদর্শ ভুলে গেছে! ভুলে গেছে তাদের পূর্বসূরীদের ইতিহাস– মুহাম্মাদ বিন কাসিমের কথা! তিনি তো এক মাযলূম বোনের চিঠি পেয়ে সুদূর আরব থেকে ভারতবর্ষে ছুটে এসেছিলেন সাহায্যার্থে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাদেরকে বর্তমান অবস্থার উপর ছেড়ে যাননি। তিনি তো তাদেরকে অন্যের বিপদে এভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে বলেননি। তিনি তো বলেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং আচরণটা তো ভাইয়ের মতই হওয়া উচিত। তাই না?

তিনি তো আরো বলেছেন, মুমিনগণ হল এক দেহের মত। যদি তার একটি অঙ্গ কষ্টানুভব করে তাহলে গোটা দেহে সেই কষ্ট অনুভব হবে। তবুও তারা নীরব, নিশ্চুপ কেন?

এই যে কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও ইরাকে চলছে হাজার হাজার মুসলিম নিধন। হাজারো মুসলিম মা-বোনদের ইয্যত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত হাজারো মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। এ নিয়ে আরব বিশ্ব বা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর কোন মাথাব্যথা আছে? কেউ কি কখনো তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বা তাদের পক্ষে ও শত্রুদের বিপক্ষে মুখ খুলেছে? আর এখানেই তাদের প্রধান দুর্বলতা। তারা তো নিজেদের মধ্যকার লড়াই-যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত। ওদিকে মনোযোগ দেয়ার সময় তাদের কোথায়?

এই বিপদের সময় ঐ সাত মুসলিম দেশের এতটুকু সান্ত্বনা ছিল না যে, এই বিপদের সময় আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা আমাদের পাশে আছে। তারা কি ভবিষ্যতে অন্যান্য মুসলিম দেশের সাহায্যে বা তাদের পক্ষে কোন কথা বলবে, নাকি তাদের পক্ষে প্রতিবাদকারী ঐ সমস্ত অমুসলিম দেশগুলোর সঙ্গ দেবে? এই যে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে এর জন্য কি ঐ সমস্ত নীরব মুসলিম দেশগুলো দায়ী নয়? তারা ঐ সমস্ত মুসলিম দেশের পক্ষে কোন রকম প্রতিবাদ করলে ভবিষ্যতে তারাও তাদের পক্ষে কথা বলতো এবং ওদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসত!

কিন্তু সে বুঝ কি মুসলিম বিশ্বগুলোর আদৌ আছে? তারা তো গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কবে ভাঙবে তাদের নিদ্রা? কবে হবে তাদের বোধোদয়?

আসিফ আসলাম
কুড়িল, ঢাকা

দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল: rabetaar@gmail.com

মোবাইল

০১৮২৬৬২১৬৬৯
০১৯২৭৩২৪৬৪৭
০১৯১২০৭৪৪৯৫

হায় গেইমস!

আবূ তোরাব মা'সূম

জামি'আ রাহমানিয়া টিনশেডের পেছনে একটু হাঁটলেই বয়ে গেছে বর্জ্যের খাল। পুরো ঢাকার পয়ঃআবর্জনা যে ক'টি প্রধান খাল দিয়ে বুড়িগঙ্গায় বিসর্জিত হয় তার অন্যতম এটি। এ খালে ভিন্ন কোন পানি নেই। কালো ঘন যে তরল পদার্থ বয়ে যায় তার পুরোটাই দূষণ, পুরোটাই বিষাক্ত। খালের দু-ধারে ছুটোছুটি করে অসংখ্য ছুঁচো। মুহাম্মদপুরের জন্য বরাদ্দ তাবৎ মশার উৎপাদনও ঐ খালে। আমার মনে হয়, খালের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে প্রতিটি মানুষ তার দুর্গন্ধ সওয়ার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

মুহাম্মদপুর থাকাকালীন চলার পথে প্রায়ই ঐ খাল হয়ে যেতে হতো। প্রতিবারই খালপাড়ে একটি ছেলেকে দেখতে পেতাম। এতোবার দেখেও আবছা অন্ধকারে ওর মুখ আমার চেনা হয়ে ওঠেনি। তবু নিয়ম করে ওখানে ওর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় অবস্থান ও অদ্ভুত আচরণ আমাকে কৌতুহলী করে তোলে। একটা পাথরখণ্ডের উপর কতোক্ষণ বসে, বোধহয় মশায় অতিষ্ঠ হয়ে আবার দাঁড়ায়। দুর্গন্ধ নিশ্চিত ওকে ছুঁয়েও যেতো না। ওর দুই পায়ের মাঝ দিয়েও ছুঁচোদের ছুটোছুটি দেখা যেতো। অনবরত থাপ্পড়গুলোর প্রতিটিতে ৫/৬ টি করে মশা মেরে চলতো ও। খালটির পাশ দিয়ে বাতাস বয় না। যতো নির্মল বাতাস, সবটা শুষে নেয় খালের ঐ বিষাক্ত পানি। তাই ছেলেটি প্রচণ্ড গরমের কারণে ভিজে থাকতো জবজব ঘামে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এতো এতো বৈরিতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও ওকে সবসময় দেখতাম নিরুপদ্রব, ভ্রুক্ষেপহীন এবং নির্বিকার! ওর গভীর ধ্যান মোবাইলের স্ক্রিনে! চোখমুখ কুঁচকে আছে। দূর থেকে বোঝার উপায় নেই কী করছে ও!! একদিন ঔৎসুক্যের আতিশয্যে ওর দিকে পা বাড়ালাম। ওর পাশে শুয়ে থাকা– আমি অন্ধকারে দেখিনি– হিংস্র কুকুরগুলো একসাথে ঘেউঘেউ করে উঠলো। আমার দেহজুড়ে পশমগুলো টিপ-ছাতার মতো সটান দাঁড়িয়ে গেলো। খানিক থমকে ভড়কে স্তম্ভিত হয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম। তারপর মোবাইলে ওকে যা করতে দেখলাম এতো নিরবচ্ছিন্নতার সাথে! সেদিন সত্যি খুব অবাক হয়েছিলাম!! কারণ গেইম আমরাও খেলি। তাই বলে এভাবে! নেশা হতে পারে; তাই বলে এমন বীভৎস নেশা! আসলে আমাদের জগতটা তখন অফলাইন গেইমে সীমাবদ্ধ ছিল। আর অফলাইনে চাইলেও আপনি অমন নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠতে পারবেন না। পরে সবার মতো আমিও জানতে পেরেছি অনলাইন গেইমের কথা। অনলাইন গেইম বর্তমান বিশ্বে একটি মহামারি। অথবা ঘাতক জ্বর। যে জ্বরে আক্রান্ত নির্বিশেষে পুরো বিশ্ববাসী। ঐ ছেলেটি খালপাড়ে বসে তখন ঐ অনলাইন গেইমই খেলতো। এখন বুঝি, অনলাইন গেইমে অমন নেশা ধরাটা খুবই স্বাভাবিক।

অনলাইন গেইমগুলো এখন শুধু বর্জ্যের ড্রেন বা খালের পাশেই খেলে না মানুষ। যেখানেই থাকো তোমরা, আল্লাহর যিকির করো। সেটা তো নেই! সেই জায়গায় এসেছে গেইমস। মানুষ এখন যেখানেই থাকুক; গেইমসে আকণ্ঠ বিভোর। এমনকি টয়লেটেও।

দোকানি রিচার্জ দিতে দেরি করছে। অথবা নাম্বার তুলতে ভুল করছে। কারণ ঐ একটাই। তার সমস্ত মনোযোগ গেইমসে। চলতে চলতে ব্যস্ত রাস্তায় হঠাৎ একজন থেমে যাচ্ছে। মানুষের ঠেলাধাক্কা খেয়েও মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে বাবা-মার নাম তুলে গালিও দিচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কারণ তার গেইমসে এখন টানটান উত্তেজনা-পূর্ণ এ্যাকশন চলছে। স্ক্রিনের ভেতরের উত্তেজনা তার চোখেমুখেও স্পষ্ট। সে ঘামছে। কপালে কুঞ্চন। গরিলা দাঁত খিঁচিয়ে স্ক্রিনে তাণ্ডব চালাচ্ছে।

একদিন মাঝপথে সিএনজি থামালো এক যাত্রী। কিন্তু সে নামছে না। ড্রাইভার বললো, ভাই নামেন!

যাত্রী বললো, কথা কয়েন না। কঠিন অবস্থায় আছি!!

ড্রাইভার কিছু না বুঝে সিএনজি টান মারতে নিলো!

সে চেঁচিয়ে উঠলো- আরে আরে, কী করতেছেন! ১০ কোটির প্লট হচ্ছে পাঁচজন মিলে। একটু খাড়ান প্লিজ! আপনে টান দিলেই নেট কানেকশন দুর্বল হয়ে পড়বে। (চলন্ত গাড়িতে নেট দুর্বল থাকে) নেট না থাকলে মাঝগেইম থেইকা বাইর কইরা দিবো।

অগত্যা আমরা সব যাত্রী তার খেলা দেখতে লাগলাম। তিন পাত্তি খেলা। তাসের একটি প্রকার। এটা দিয়ে শুধু জুয়াই খেলা যায়। তাসের আরো অনেক খেলা আছে যেগুলো জুয়া ছাড়াও খেলা সম্ভব। যদিও অভদ্রোচিত। সে এক কোটির চাল দিচ্ছে, আর একটা করে গালি দিচ্ছে। চূড়ান্ত উত্তেজনায় মানুষ যা করে। পট পুরা হলো। সে মোবাইল হাঁটুর উপর রেখে দুই হাত দিয়ে নিজের দিকে টাকা টেনে আনার ইশারা করতে লাগলো এই বলে, আয় আয়! উম্মাহ, আয়! কিন্তু টাকাগুলো ধীরলয়ে অন্য খেলোয়াড়ের একাউন্টে চলে গেলো। তার চোখে অবিশ্বাস। মেনে নিতে না পারার আগুন। দরদর ঘাম ঝরছে কপাল থেকে। কারণ তার কার্ড খুবই ভালো ছিল। জেতাটা প্রায় নিশ্চিতের মতো। একসাথে এতো টাকা হেরে নিজেকে সামলাতে পারলো না। তার দামি স্যামসাংটা ছুঁড়ে মারলো শক্ত পিচে। শাঁ করে ছুটে আসা একটি ট্রাকের গজাল চাক্কায় পিষ্ট হয়ে ওটার প্রয়াণ ঘটলো।

এমন কিছু ঘটবে, এর জন্য আমি মানসিকভাবে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হান্ড্রেড টেম্পারেচারে অবাক হলাম। একটি গেইমসের কী বাস্তবতা! না এর টাকার কোন অস্তিত্ব আছে! না এর মাঝে কোন সার আছে! এমন একটি অন্তঃসারশূন্য খেলা ও নিছক মেনে নেয়া টাকা নিয়ে কিভাবে মানুষ একটি দামি মোবাইল ছুঁড়ে ফেলে! এবং এই হারের কারণে চার/পাঁচ দিন মনমরা হয়ে থাকে। বন্ধুদের আড্ডায় নির্লিপ্ত তাকে কেউ কারণ জিজ্ঞেস করলে কিভাবে উত্তর দেয়– আরে কইস না! তিন পাত্তিতে চরম মাইর খাইছি! ভুলতেই পারতাছি না!

এই গেইমগুলোর নেশা এমন যে, বাবার লাশের পাশে দাঁড়িয়েও ওটার কথা ভুলতে পারবে না। পথে, বাহনে, কর্মস্থলে, নিভৃতে, আড্ডায়, মাহফিলে, মসজিদে, জুমু'আর খুতবার মাঝে, এমনকি বাসর রাতে নতুন বিবির পাশেও মানুষ বিভোর এই গেইমসে! অনেকটা সেলফি-জ্বরের মতো। এখন তো কাছের মানুষের লাশ নিয়ে সেলফি তোলাটাও খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যাকগে। আজ গেইমসের গল্পই চলুক। সেলফি নিয়ে আরেকদিন আসর জমানো যাবে।

অনলাইনে জনপ্রিয় অনেক গেইম আছে। অনলাইন গেইমগুলো সবচে বেশি খেলে আরবের ধনকুবেররা। তারা শুধু যে খেলে ব্যাপারটা এমন না। দ্রুত লেভেল বাড়ানোর জন্য এবং সারা বিশ্বে গেইমে হাইস্কোর ধরে রাখার জন্য মেধাবী তরুণদের বেছে বেছে চড়া পারিশ্রমিকে ভাড়া করে চব্বিশ ঘণ্টা গেইমে সক্রিয় রাখে।

সবার ঘরেঘরে ল্যাপটপ কম্পিউটার। এবং প্রায় মায়েদের হাতেই আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড। ফলে শিশুরাও ভয়াবহভাবে আক্রান্ত এই গেইম জ্বরে। একেকটা শিশু

মোবাইলের স্ক্রিনে এত্তো উত্তেজিত হয়ে ফায়ার করতে থাকে যে ঘেমে জবজব হয়ে যায়। গাল দুটোয় রক্ত জমে গোলাবের মতো রক্তিম হয়ে ওঠে। সবাই চাইছে শিশুরা পড়ায় মন দিক। গেইম খেলে কচি মেধাটাকে নষ্ট না করুক। কিন্তু ঘরে ওদের হাতের কাছে ওসব রেখে তা কি আর সম্ভব!!!

অবশ্য শিশুদের এই গেইম-মোহের প্রতিষেধক হিসেবে কোন কোন ডেভেলপার আলিফ-বা-তা, অ-আ, সূরা ও হাদিসের গেইম বের করেছে। ওটাও একটা পুঁজিবাদী ধান্ধা। মায়েদের বোঝানো হচ্ছে, শিশুদের নেতিবাচক কথা বলবেন না। ওরা গেইম খেলে; খেলুক। এবার গেইমে গেইমে ওদের শিক্ষার ভিত রচিত হবে। পুঁজিবাদের এই বিজ্ঞাপনে মায়েরা প্রভাবিত হয় এবং এই ধরণের শিক্ষক-গেইম ডাউনলোড করতে থাকে খুঁজে খুঁজে। ধান্দাবাজদের ধান্দা তো হয়েই যায়। ওদিকে বাচ্চাদের কি ওতে পেট ভরে!!! যেকোন মূল্যে ওরা মায়েদের কাছ থেকে ফায়ারিং ও রেসিং গেইম বাজেট করে নেয়। এমনকি এটাও দেখেছি, বাবা এক লাইফ খেলে। সন্তান এক লাইফ। পাকঘর থেকে মায়ের হাঁক আসে বাবুর উদ্দেশে, সাদীদ! সব লাইফ শেষ করো না! তারপর রান্না শেষে মা গেইমে ডুবে থেকে বাচ্চাকে শাসন করে, সাদীদ! পড়তে বসো! এই হলো বর্তমান পরিস্থিতি।

গভীর দৃষ্টি দিলে দেখবেন, কুরআনে আমাদের ঐকমত্য নেই। হাদিসে আমাদের আস্থা নেই। নামায দিয়ে ঐক্য হয়নি আজো। শরীয়তের বিধানাবলীতে আমাদের নানা প্রশ্ন। দাড়ি নিয়ে বিষোদগার। মাদরাসা নিয়ে কতো কথা! মোটকথা ধর্মে-কর্মে এবং ধর্মীয় অনুশাসনগুলোতে আমাদের মোটেও ঐক্য নেই।

অথচ একটি জায়গায় আমাদের দারুণ ঐক্য দেখা যাচ্ছে। গেইম। হ্যাঁ, কেবল গেইমেই পুরো বিশ্ব সিরিয়াল ধরে ঐক্যে দাঁড়িয়েছে। নির্বিশেষে। নির্ভেদে। সবাই গেইম খেলছে। নাস্তিকও খেলছে, আস্তিকও খেলছে। হুযূর খেলছে, পাবলিকও খেলছে। হানাদার বাহিনী খেলছে, হানাদারদের দ্বারা যারা আক্রান্ত তারাও খেলছে। এইখানটাতেই কোন সমস্যা নেই। বাঁকা চোখ নেই। অথচ নতুন নামায-রোযা ধরলেই, নতুন দাড়ি রাখলেই সবাই ভিন্ন চোখে দেখছে। সমাজচ্যুত করছে। আমাদের মস্তিষ্কেই এটা সুক্ষ্মভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় অনুশাসন মানেই গোঁড়ামি ও অসামাজিকতা। আর এসব প্রবৃত্তি, প্রযুক্তি, প্রগতি ও পার্থিব উৎকর্ষগত যতোকিছু আছে সব উদারতা ও সামাজিকতা। অথচ ওদের শেখানো ঐ সামাজিকতা ও উদারতার মধ্য দিয়েই কখন যে আমাদের সমাজে চিন্তাগত বক্রতা, ইহজাগতিকতা ও ধর্মহীনতার অনুপ্রবেশ ঘটে যাচ্ছে আমরা টেরই পাচ্ছি না।

এই গেইমগুলো কেবল বিনোদনই নয়। এগুলো যেন পুঁজিবাদের বিষাক্ত একেকটি ছোবল। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান একটি গেইম হলো ফিউচার ফাইট। গেইমটি ১০ মিলিয়নের বেশি মানুষ খেলে। আমরা আমাদের যেই শত্রুদের বিরুদ্ধে শ্লোগানে শ্লোগানে রাজপথ কাঁপাচ্ছি, ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে সেই তাদের তৈরি গেইমে ডুব দিচ্ছি নির্ভার হতে। এই একটি গেইম দিয়ে তারা আমাদের থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে!!! সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ বেখবর!!! বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে জয় অর্জন করতে হবে আমাদের।

অন্য দিকে, এই গেইমগুলোর মাধ্যমে বিনোদনের নামে মূলত তারা আমাদের ঝোঁক, রুচি, সভ্যতা, সমাজ– সবকিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছে। আমাদের অজান্তেই আমরা সেক্যুলার হয়ে উঠছি। আলেমবিদ্বেষ ঢুকে যাচ্ছে আমাদের মাঝে অবচেতনে। স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছি। ক্রমশ দাসে পরিণত হচ্ছি। এই গেইমগুলোর কারণে আমরা অকর্মন্য হচ্ছি। কিতাবের একটি পৃষ্ঠা বোঝার যে স্বাদ, বই পাঠে যে স্বর্গীয় মুগ্ধতা– সব হারিয়ে ফেলছি। আমাদের সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। কারণ তারা গেইমের লেভেলগুলোয় এমন পদ্ধতি রেখেছে যে, সারাদিনে চেষ্টা করে একেবারে লক্ষ্যের কাছাকাছি, মাত্র একধাপ বাকি থাকতেও যদি কোন ভুল করেন তাহলে লেবেল আবার শুরু থেকে আরম্ভ করতে হবে। অথচ কিতাব একটা পর্যায় পর্যন্ত বুঝে রেখে মাথা গরম হয়ে গেলে সকালে উঠে তারপর থেকে বুঝতে পারা যায়। শুরু থেকে আরম্ভ করতে হবে না।

আর কতো বলবো! এতো বলে লাভ কি! কথা ব্যস একটাই। আসুন, গেইমের নয়; ঐক্য গড়ে তুলি নামাযের। সঠিক বিশ্বাসের। ধর্মীয় অনুশাসনগুলো যথারীতি পালনের। তাহলে খালের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা লাগবে না। রাস্তার মাঝে হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণে মানুষের গালাগাল শুনতে হবে না। মোবাইল আছাড় থেকে বেঁচে যাবে। কিতাব বোঝার ও বই-পাঠের সময় বের করতে পারবেন। জীবন গোছালো হবে। বাবা-মার বকা খেতে হবে না। বন্ধুদের সময় দিতে পারবেন। কাজে মন দিতে পারবেন। সময়মতো মসজিদে যেতে কোন বাধা থাকবে না। মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন থাকবে না। মোবাইল-প্রেমীদের জন্য সবচে আনন্দের বিষয় হলো মোবাইলের চার্জ সহজে ফুরাবে না। এই বলে আমার লেখা শেষ করছি।

লেখক : শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

মাদ্রাসাতুল হুদা আল আরাবিয়া ঢাকা

মাদানী নেসাব

* মাদরাসাতুল মাদীনার সাবেক আসাতিযায়ে কিরামের পরামর্শে পরিচালিত।
* মাদরাসাতুল মাদীনার ফারেগীন, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পাঠদান।
* তা'লিম-তরবিয়াতের সমন্বয় ও সময়ের যথাযথ হেফাজত।
* ভর্তি সুবিধার জন্য ১লা রমজান থেকে প্রাথমিক যাচাই এবং ফরম বিতরণ করা হবে।
* ৭ই শাওয়াল থেকে নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে ভর্তি নেওয়া হবে।
* ১২ই শাওয়াল থেকে দরস শুরু হবে।
* ভর্তির সময় অভিভাবকের উপস্থিতি আবশ্যক।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বিঃ দ্রঃ দরস প্রদান করবেন
হযরত মাওঃ মাহবুবুর রহমান সাহেব (দাঃবাঃ) (নাযেম সাহেব হুজুর)
হযরত মাওঃ হাসান আল মেসবাহ সাহেব (দাঃবাঃ) (প্রাক্তন উস্তাদ, মাদরাসাতুল মাদীনাহ)

ঘাটারচর শাখা
১ম বর্ষ থেকে ৪র্থ বর্ষ
মোহাম্মাদপুর বাসষ্ট্যান্ড থেকে আটিবাজার রোড, ঢাকা।

মেরুল বাড্ডা শাখা
১ম বর্ষ, আরবী ভাষা বিভাগ, হিফজ, নাজেরা ও মক্তব বিভাগ
ডি আই টি প্রজেক্ট মেরুল বাড্ডা, ঢাকা

তত্ত্বাবধানেঃ
হযরত মাওঃ মাহবুবুর রহমান সাহেব (দাঃবাঃ)
(নাযেম সাহেব হুজুর)
মুহতামিম, মারকাজুল কুরআন, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

নিবেদকঃ
মাওঃ নূরে আলম সিদ্দীক
মুহতামিম, মাদ্রাসাতুল হুদা আল-আরাবিয়া ঢাকা।
মোবাইল নং- ০১৯২৩-২৬০৪৯০

ঘাটারচর শাখা- ০১৯১৬৩৩৩১৯২, ০১৯৪০৬৪৫৯৪৩, ০১৭৬৬৯৩৩৪৫০
মেরুল বাড্ডা শাখা- ০১৯১৬১৪৬৭৬২, ০১৯১৫৬৯৩৬২৬, ০১৭৬৬৯৩৩৪৫০

ঝরা কলির সমাধি শিয়রে বেদনার আঁখিজল

তুমি কি আরবী ভাষা শিখতে চাও? আমার পাশে থাকা নতুন ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে সে-ও উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমি শিখতে চাই।

তবে সে পারল না। পারবেও না কোনদিন। মনের আশা মনেই রয়ে গেল তার। সে এখন আর আমার পাশে নেই। এমন জায়গায় আছে, যেখানে আছে শুধু অন্ধকার, নিকষ কালো অন্ধকার। যেখানে আরবী শেখানোর কোন উস্তাদ নেই। নেই সরফ পড়ানোর কোন হুযূর। তার সাথে গল্প করবে এমন কেউ নেই। ছুটির দিনে ওকে নিয়ে কেউ ঘুরতেও যায় না বসিলার পাশ ঘেঁষে বয়ে চলা বুড়িগঙ্গায়। নৌকা দুলিয়ে আমাদের ভয় দেখানোর মতও আর কেউ নেই। ও আমাদেরকে আর ভয় দেখাবে না। আমরা আর ওকে পাবো না। কোন দিন পাবো না। ও যে চলে গেছে অন্য এক জগতে। আর ফিরে আসবে না নশ্বর এ ভুবনে।

ওকে আমরা আব্দুল্লাহ রিফাত নামে ডাকতাম। আমাদের প্রিয় সহপাঠী। বেশিদিন হয়নি আমাদের মাঝে এসেছে। সে তুলনায় প্রিয় হয়ে উঠেছিল অনেক বেশি। যাদেরকে আমরা ভালো বলতাম সে ছিল তাদের অন্যতম। হঠাৎ ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত বছর ১৯ নভেম্বর রাহমানিয়া কাননের এ গোলাপ কলিটি তারুণ্যের ধাপ না পেরিয়েই দরবারে ইলাহীতে হাযিরা দিয়েছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও পরম সত্য যে, রিফাত আর নেই।

আমাদের প্রিয় নেগরান, উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে শুনতে পেলাম, হুযূরের সঙ্গে কিছু ছাত্রভাই মানিকগঞ্জ যাবে রিফাতের কবর যিয়ারতে। ক্ষীণ আশা জাগল, আমিও যাব। কিছুদিন আগে আরেকজন উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুযূর আমাদেরকে আরবী বাক্য রচনা করতে বলেছিলেন। তখন আমি একটি বাক্য লিখেছিলাম,

اريد ان اذهب الى بيت رفعت لأزور مقبرة.

অর্থ : আমি রিফাতের কবর যিয়ারতে ওর বাড়িতে যেতে চাই।

আল্লাহ তা'আলা হয়তো এ বাক্যটি কবুল করেছেন।

আশা পূর্ণ হল। আমিও যাব মানিকগঞ্জ সফরে। রাতেই গাড়ি ঠিক করে রাখা হয়েছে। যোহরের নামায হাসান সিদ্দীক সাহেব হুযূরের মসজিদ বাইতুল ফিরদাউসে পড়তে হবে।

১২টা ৪৫ মিনিট। একটি মাইক্রোবাস এল গুলশানে আবরার রোডে। আমরা দশজন সহপাঠী উঠে বসলাম। আমাদের আরেক প্রিয় উস্তাদ মাওলানা শফীক সালমান সাহেব আমাদের রাহনুমায়ী করলেন।

হাসান সিদ্দীক সাহেব হুযূর আমাদের আমীরে সফর । তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন দু'আ-দুরূদ পড়তে বললেন। আর বললেন, রিফাতের ঈসালে সওয়াবের জন্য এক খতম কুরআন পড়া হোক। দশজন হাফেযকে তিন পারা করে ভাগ করে দেয়া হল।

অগণন গাছের সারি পেছনে ফেলে তুমুল বেগে ছুটে চলছে গাড়ি। গন্তব্য মানিকগঞ্জের তরা ব্রিজ। অন্য সময় হলে এ দৃশ্যগুলো খুব উপভোগ করতাম। কিন্তু কেন জানি আজ এগুলো কিছুই ভালো লাগছে না। এমনকি জীবনে প্রথমবার স্মৃতিসৌধ দেখলাম সেটাও যেন ম্রিয়মান মনে হল। সাভার বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে আমাদের মলিন চেহারাগুলোকে একটু সজীব করতে উস্তাদে মুহতারাম শফীক সালমান সাহেব গাড়ি থামিয়ে নেমে গেলেন পাশের এক কনফেকশনারীতে। চিপস, কেক আর পানি নিয়ে এলেন। আরো আনলেন 'ট্যাবলেট' সাইজ সিঙ্গাড়া-সমুচা। একসঙ্গে ৩/৪টি করে অনায়াসে মুখে পুরে দেয়া যায়। দু'টাকা করে পিস। স্বাদও অতুলনীয়। এগুলোর সাইজ দেখে এমন বেদনাঘন সময়েও আমাদের হাসি পেল।

সামনে একটি ফলক দেখতে পেলাম। লেখা 'বিদায় ঢাকা, স্বাগতম মানিকগঞ্জ'। একটা দু'টো করে অনেকগুলো ব্রিজ পার হলাম। এখান থেকে সহপাঠী সিদ্দীক আমাদের রাহবার। তার বাড়িও রিফাতের বাড়ির কাছে। ও বলল, 'সামনের ঐ ব্রিজের পরই ডান দিকে মোড় নিতে হবে'। ব্রিজের নাম তরা ব্রিজ, নিচে প্রায় মরা একটি নদী। সরু রাস্তা ধরে সামনে এগুতেই দেখতে পেলাম, রিফাতের আব্বা আমাদেরকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমরা আগে জানাতে চাইনি। যদি খানা-পিনার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই আমাদের সফরের খবরটা শুধু সিদ্দীকের বাড়িতে জানানো হয়েছে যে, রিফাতের আব্বা যেন বাড়িতে থাকেন। আমাদের দেখেই তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। দু'চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে। বড়দের এভাবে কেঁদে ওঠা আমি কখনো দেখিনি। আমাদের দিকে কেমন করে তাকিয়ে থাকলেন, হয়তো বা আমাদের মাঝে তার হারানো মানিক রিফাতকে খুঁজছিলেন।

তিনি আমাদেরকে বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। আমরা বললাম, আগে মসজিদে যাওয়া যাক। সেখান থেকে কবরস্থান যিয়ারত করে তারপর বাড়িতে আসা যাবে।

নামায পড়ে জানতে পারলাম, কবরস্থান একটু দূরে। গাড়িতে যেতে হবে। আবার গাড়িতে উঠলাম। আমাদের সাথে উঠলেন রিফাতের নানা। তিনিও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

মহাসড়কে উঠে গাড়ি এবার ছুটল কবরস্থানের দিকে। মেডিকেলের প্রবেশ মুখেই মেইন রাস্তা সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে প্রাচীর ঘেরা কবরস্থান। এটাই আমাদের গন্তব্য, যে গন্তব্যে আমাদের প্রিয় ভাই রিফাত অনেক আগেই পৌঁছে গেছে।

কবরস্থানের দিকে এগুচ্ছি। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। শোনা যাচ্ছে শুধু আমাদের পদধ্বনি। দু'টি পাখি এসে সামনের ঐ তারটির উপর বসল। কিচির মিচির করে ওরাও কী যেন বোঝাতে চাইল; বুঝলাম না। কবরস্থানের গেটে তালা ঝুলছে। বিষণ্ন মনটা আরো বিষণ্ন হয়ে উঠল– এতদূর থেকে এসেও যদি দূর থেকেই ফিরে যেতে হয়! এমন সময় একজন বললেন, ওদিক দিয়ে প্রবেশের রাস্তা রয়েছে। ঘুরে গিয়ে বিকল্প রাস্তা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সামনের কাঁচা বাঁশে ঘেরা নতুন কবরটা দেখে মনটা হাহাকার করে উঠল। নাহ! কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না! মনের অজান্তে কখন যেন চোখের পানিতে বুক ভিজে উঠল। হাসান সিদ্দীক সাহেব হুযূর দু'আ শুরু করলেন। অঝোরে কাঁদছেন তিনি। এ যে তারই প্রিয় রূহানী সন্তান। সাথীরাও জারজার হয়ে কাঁদল।

দু'আ শেষে রিফাতের মামার সঙ্গে দেখা হল। তিনি আক্ষেপ করে বললেন, 'আহা! ছেলেটা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আমাকে বলছিল, মামা! হয়তো আর মাদরাসায় যাওয়া হবে না! তাহলে আপনিই আমাকে মীযান কিতাবটা পড়িয়ে দিবেন। কত আগ্রহ ইলম অর্জনের প্রতি! প্রায়ই বেডে শুয়ে সে ইলমুস সরফের 'গরদান' জপত। যিয়ারত শেষে ওকে ছাড়াই ওর বাড়িতে এলাম। উঠোনে একটি বড় টেবিল।

চারপাশে চেয়ার পাতা। আমরা সেখানেই বসলাম। শফীক সালমান সাহেব হুযূর বাড়ির মহিলাদেরকে ঘরের ভেতরে বসতে বললেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে প্রথমে আমাদের সফরের উদ্দেশ্য বললেন। অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন প্রিয় ছাত্রের জানাযায় শরীক হতে না পারায়। বললেন, আগে জানতে পারলে আমরাও তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারতাম। জামি'আর মুরুব্বীদের পক্ষ থেকে সালাম এবং সান্ত্বনার বাণী পৌঁছে দিলেন। ব্যস্ততার কারণে আসতে পারেননি, সে জন্য ওযরও পেশ করলেন। সামনে মুরুব্বীরা এদিক দিয়ে সফরে গেলে যিয়ারতের আশ্বাস দিলেন। রিফাতের আম্মা-আব্বাকে ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন, 'এরা সবাই আপনাদের সন্তান। আপনারা সবসময় রাহমানিয়ায় যাওয়া-আসা চালু রাখবেন'।

এরপর আমাদের নেগরান সাহেব হুযূর কথা বললেন। তিনিও সান্ত্বনা দিলেন তাদেরকে। বললেন, 'আশা করি ও শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে। একেতো তালিবুল ইলমী যামানায়, দ্বিতীয়ত ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেছে। ক্যান্সারের মৃত্যু শহীদী মৃত্যুর সমমর্যাদার'। হুযূর তাদেরকে হা-হুতাশ করতে বারণ করে বললেন, 'আমারও একটা ছোট্ট ভাই ছিল। ছোট বয়সে ইন্তেকাল করেছে। তার কথা স্মরণ করে আমার আম্মা এখনো কাঁদেন'। মৃত ছোট ভাইয়ের কথা স্মরণ করে হুযূর নিজেও কাঁদলেন।

কথা শেষ হলে ভেতর থেকে বিভিন্ন প্রকার নাস্তা আনা হল। আশ্চর্য! এই শোকাবহ অবস্থায় এত কিছুর ব্যবস্থা করা কীভাবে সম্ভব? হুযূররা বললেন, যে আশঙ্কায় আগে থেকে জানানো হয়নি, অবশেষে তাই-ই হল।

এবার ফেরার পালা। আমরা সবাই রিফাতের আব্বার সঙ্গে মুসাফাহা করলাম। হাসান সিদ্দীক সাহেব হুযূর আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'এরা সবাই আপনারই সন্তান। ছেলের কথা মনে পড়লে রাহমানিয়ায় চলে আসবেন'। আবারও কেঁদে ফেললেন তিনি। আমরা রওয়ানা হলাম। তিনি আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল নয়নে তাকিয়ে থাকলেন।

মুহাম্মাদ মু'আয কুমিল্লায়ী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

অশ্রু ভেজা স্মৃতি ২১শে ফেব্রুয়ারি

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। শেষ রাতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানা ছেড়ে উযূ-ইস্তিঞ্জা করে মসজিদুল আবরারে প্রবেশ করলাম। বেশ কিছু তালিবুল ইলম কিয়ামুল লাইলে মশগুল। পুরো মসজিদ জুড়ে গুঞ্জরিত হচ্ছে কান্নার ধ্বনি। ১৯৫২ সনে যারা মাতৃভাষার জন্য শহীদ হয়েছিলেন তালিবে ইলমরা কাঁদছেন তাদের মাগফিরাত কামনায়। কী অপরূপ দৃশ্য।

নিঝুম রাত। পুরো এলাকা ঘুমে বিভোর। কোথায়ও কোলাহল নেই। নেই যানবাহনের বিরক্তিকর শব্দ। মাঝে মধ্যে কানে ভেসে আসছে মসজিদুল আবরারের ফলকে বাসাবাঁধা চড়ুই পাখির মৃদু কিচিরমিচির। মনে হচ্ছে তারাও যেন আমাদের সঙ্গী হয়ে ফরিয়াদ করছে রাব্বুল আলামীনের দরবারে।

আগে তাহাজ্জুদের ঘণ্টির আওয়াজে জেগে ওঠে আকাশ পানে তাকাতেই দেখতে পেতাম চাঁদের উজ্জ্বল হাসি। গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকারাজির ঝিলমিল আলো। কিন্তু আজ কারো মুখে হাসি নেই। নেই মেঘ আর তারার লুকোচুরি। উযূখানার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা নারিকেল গাছ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে কোন ভাষা নেই, নেই নড়াচড়া। সকলেই যেন শোকাহত; শহীদানের স্মরণে ফরিয়াদ করছে নিশ্চুপ হয়ে। খানিক পর ফজরের আযান হল। আমরা চলে আসি যার যার রুমে। আজ ছুটির দিন বলে সবাই নির্ভার আছি। মমতা মিশিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করছি যতটুকু সুর ঠিক ততটুকু মাধুরী দিয়ে।

ফজরের নামায আদায়ান্তে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত শেষে একটি পুস্তক হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করি। সহসা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে উস্তাদে মুহতারাম রফীকুল্লাহ আল-মাদানী দা.বা. এর যবান থেকে শোনা বেদনাতুর এক বাক্য। তা হল, আমরা আজ প্রতারণা করছি শহীদানের তাজা রক্তে অর্জিত মাতৃভাষার সাথে। আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, আব্দুস সালাম ও রফিক উদ্দীন আহমদের আত্মত্যাগ ভুলে গিয়েছি। লিপ্ত হয়েছি নব আবিস্কৃত ভেজাল মিশ্রিত বাংলিশ ভাষাকে নতুন করে মাতৃভাষায় স্থান দিতে। আমরা কি একবার ভেবে দেখেছি, আমাদের এ স্বাধীন ভূমিতে আজ কী চলছে? ব্যাঙের ছাতার মত জন্ম নেয়া এফ.এম রেডিও, টিভি চ্যানেলগুলো হিন্দি আর ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতি জোর করে গেলাবার অপচেষ্টা করছে। তাই কেমন যেন আমরা স্বাধীন হয়েও পরাধীনতার আঁধারে নিমজ্জিত। সবশেষে তাই বলছি, এসো বন্ধু! মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরি আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই মহান ভাষাসৈনিকদের প্রতি।

মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম তাজ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম অভিবাসী নিষেধাজ্ঞা! মুসলিম বিশ্ব নীরব কেন?

গত ফেব্রুয়ারির শুরুতে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাতটি মুসলিম দেশের (ইরাক, ইরান, সিরিয়া, ইয়েমেন, সুদান, সোমালিয়া ও লিবিয়া) নাগরিকদের উপর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞার নির্বাহী আদেশ জারি করেছিল। তার আদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতা ও নাগরিকগণ প্রতিবাদ জানিয়েছিল। খ্রিস্টান প্রধান পশ্চিমা দেশগুলোও এ আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের সমালোচনা করেছিল।

শুধু তাই নয়; নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন, ওয়াশিংটনসহ যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরগুলোতেও মার্কিন নাগরিকগণ ট্রাম্পের এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল। তারা 'STOP TRUMP'S MUSLIM BAN' (ট্রাম্পের মুসলিম নিষেধাজ্ঞা বন্ধ করো), 'STOP THE WAR' (যুদ্ধ বন্ধ করো) সহ বিভিন্ন ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল ও স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। তাছাড়া সানফ্রান্সিসকোর একটি আদালত ট্রাম্পের এই আদেশের বাস্তবায়ন স্থগিত করে দিয়েছিল। পুনরায় ট্রাম্প আপিল করলেও আদালত নিজ রায়ের উপরই অটল ও অবিচল থেকেছে। অবশেষে তোপ ও চাপের মুখে পড়ে ট্রাম্প নিজ আদেশ পরিবর্তনের আশ্বাস দেয়।

এখন দেখার বিষয় হল, ট্রাম্পের এই মুসলিম নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কতটি মুসলিম দেশ প্রতিবাদ করেছে? দেখা যাবে, এ নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে প্রায় সকল মুসলিম দেশেরই কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ট্রাম্পের এ আদেশের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশের নেতা ও নাগরিকরা সরব থাকলেও মুসলিম দেশের নেতাগণ বরাবরই ছিলেন নীরব দর্শক। হয়তো তারা ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞাকে মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন, নয়তো তাকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া ছিল নিশ্চুপ, যেন তাদের মুখ তালাবদ্ধ। তারা তো কোন প্রতিবাদ করেইনি, উপরন্তু দেশটি তাদের নাগরিকদের ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে নিষেধ করে দেয়।

'ফরেন পলিসি' সাময়িকী তাদের এক প্রতিবেদনে জানায়, এক অনুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো বলেছেন, ট্রাম্পের নীতির প্রভাব আমাদের উপর পড়েনি, সুতরাং আমরা মুখ খুলব কেন?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন তিনি। ঐ সমস্ত মুসলমানরা তো তাদের কেউ হন না। অতএব তাদের সমস্যা কী? কিন্তু যখন আদেশের পালাটা ঘুরে তাদের দিকে আসবে তখন...

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজ্জাকের কোন টু-শব্দও শোনা যায়নি।

(৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

নাজমুল হাসান বাগেরহাট (জামা'আতে তাকমীল)

ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া। এখানে দাওয়াত, তা'লীম ও তাযকিয়ার সমন্বয়ে ছাত্রদের জীবন গড়ে তোলা হয়। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি তরবিয়তের ব্যাপারে অত্যধিক যত্ন নেয়া হয়। এ কারণে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ছুটে আসে বহু ইলম পিপাসু তালিব; ইলমের এই দরিয়ায় ডুবে থাকা ইলমে ওহীর মণি-মুক্তা আহরণের জন্য।

প্রথম বছর : শিক্ষাতরীর শুভযাত্রা

১৪২৮-২৯ হিজরী সন। আমরা ৭০ জন তালিবে ইলম ওহীর জ্ঞান-সুধা আহরণে ছুটে এসেছিলাম এ ইলমী কাননে। সকলেই অপরিচিত। কারো সঙ্গে কারো চেনা-জানা নেই। বসে আছি হলরুমের দক্ষিণ পাশে। সবাই নিশ্চুপ। ছিট বণ্টন, কানুন শুনানী ও ইফতিতাহী মজলিস শেষ। আমাদের ৭০জনকে 'ক' ও 'খ' গ্রুপে বিভক্ত করা হল। শুরু হল পূর্ণ উদ্যমে পড়ালেখা। ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হল। জেগে উঠল সৌহার্দ্য, মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা । একই সুতোয় গাঁথা হল ৭০ এর ইতিহাস; যেন একই মায়ের সত্তরটি সন্তান।

তরবিয়তের স্মৃতিকথা

নেগরানীর দায়িত্ব পালন করতেন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা আনওয়ারুল হক সাহেব। তিনি হাফেযদের জন্য দৈনিক তিন পারা এবং গাইরে হাফেযদের জন্য এক পারা তিলাওয়াত অপরিহার্য করে দিলেন। একদিন এক ছাত্রভাই নির্ধারিত অংশের কম তিলাওয়াত করল। হুযূর তাকে বেডিং মাথায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। সেদিন লজ্জায় ছাত্রটি কুঁকড়ে গিয়েছিল ঠিক, কিন্তু আমাদের সকলের সংশোধনের জন্য এই শাস্তি খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। সেই থেকে আমরা কুরআন তিলাওয়াতে অবহেলা করিনি। প্রত্যহ নির্ধারিত অংশ তিলাওয়াত করে দরসে বসতাম।

দ্বিতীয় বছর : শৈশবের ঘাটে শিক্ষাতরী

শিক্ষা শৈশবের দ্বিতীয় বছর। মীযান জামাআতে উন্নীত হয়েছি। কোন গ্রুপে বিভক্ত হওয়া ছাড়াই সকলে একই সঙ্গে পাঠ গ্রহণ করছি। আমাদের দেখভাল করেন বর্তমান নাযেমে তা'লীমাত মাওলানা হেলালুদ্দীন সাহেব গাজীপুরী হুযূর এবং ভৈরবী সাহেব হুযূর।

দু'টি ঘটনা

এক. পুরস্কার ঘোষণা : কুরবানীর বন্ধের আগের দিন। ভৈরবী সাহেব হুযূর আমাদের সকলকে ডাকলেন। বললেন, বন্ধের মধ্যে যে পূর্ণ এক খতম কুরআন পড়বে তাকে আমি পুরস্কৃত করব।

এই ঘোষণায় ভালো ফল হল। পুরো বন্ধে আমরা অনেকে কুরআনের সাথে সম্পর্ক রাখলাম। বন্ধের পর হুযূর পুরস্কার স্বরূপ আমাদের হাতে 'কুরআনের দুর্লভ ঘটনাবলী' বইটি তুলে দিলেন। হুযূরের পুরস্কার ঘোষণার রহস্য তখন বুঝিনি; নিজ অর্থ ব্যয় করে আমাদের তরবিয়ত! মনে হলে চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

দুই. উস্তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'না'ত' : জামালী চেহারার অধিকারী গাজীপুরী হুযূর। সকলের কাছে কাতিবে জামীল ও মুনশিদে হাসীন হিসেবে পরিচিত। সবক বন্ধের কয়েকদিন বাকী। আমরা সকলে একজোট হলাম, আজকে হুযূরের কণ্ঠে না'ত শুনতেই হবে। হুযূর দরসে এলেন। আমরা সমস্বরে আবেদন জানালাম। হুযূর বললেন, আগে তোমরা শোনাও, পরে আমি। কোকিল-কাকের বৈচিত্রে আমরা অনেকে শোনালাম। এবারে হুযূরের পালা। সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। কাঙ্ক্ষিত ক্ষণ যেন এসে গেছে। হুযূরও একটু নড়েচড়ে বসলেন। সবদিকে একবার চোখ বুলিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, 'আমার না'ত বলা' শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মাথা নিচু করে রাখবে। আমরা দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে অধীর আগ্রহে বসে আছি, এই বুঝি শুরু হল। এমন সময় হুযূর একটু উচ্চ কণ্ঠে 'না'ত' শব্দটি উচ্চারণ করেই দ্রুত দরসগাহ ত্যাগ করলেন। হুযূরের কৌশল বুঝতে আমাদের আধা সেকেন্ড লাগল। এরপর সেকি হাসি!

হুযূর এভাবে বহুবার আনন্দ প্রদান করে আমাদেরকে বাড়ির মায়া ভুলিয়ে দিয়েছেন।

তৃতীয় বছর : কৈশোরের ঘাটে

আমরা এখন নাহবেমীরের ছাত্র। শিক্ষা জীবনের কৈশোরকাল। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক হলেন রাহমানিয়ার তৎকালীন নাযেমে তা'লীমাত হুযূর, যিনি বর্তমান নায়েবে মুহতামিম। তিনি বাবা হুযূর নামেও পরিচিত। অত্যন্ত সুন্দর ও মুগ্ধকর ভঙ্গিমায় তিনি নাহবেমীরের দৈনন্দিন সবক মুখস্থ করিয়ে দিতেন। তিনি একজন আদর্শ বাবা। আদরের সময় আদর করেন অতুলনীয় আর শাসনের সময় করেন প্রজ্ঞাপূর্ণ শাসন। দরসে কেউ পড়া না পারলে তাকে পিটুনি দিতেন। কিন্তু তখনো তার চেহারাটা হাসি হাসি থাকত, যবানে থাকত দু'আ। পিটুনি দিতে দিতেই ছাত্রটিকে বলতেন, নিজে নিজেকে বলো, 'পড়স নাই ক্যান? পারস নাই ক্যান? মাইর খাইছস ভালো হইছে, আরো যদি দিত ভালো হইত'। কী অপূর্ব তরবিয়ত! ব্যথার পরিবর্তে অনুশোচনা সৃষ্টি হত।

আজ খুব ইচ্ছে করছে বাবার হাতের পিটুনি খেতে। কিন্তু বাবা কি আর অমন করে পেটাবেন? সত্যি! স্মৃতি মানুষকে কাঁদায়।

চতুর্থ বছর : কৈশোরের শেষ ঘাট

বিগত বছরগুলোর সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে নাহবেমীরে সবচেয়ে বেশি সিরিয়াল পেলাম আমরা। উস্তাদগণ অনেক খুশি হলেন। প্রাণভরে দু'আ করলেন। হুযূরদের দু'আকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে শুরু হল হেদায়াতুন্নাহব জামাআতে পথচলা। নেগরান হলেন খুলনার হুযূর এবং উমর ফারূক বিক্রমপুরী সাহেব হুযূর।

খুলনার হুযূরের নসীহত

হুযূর দরসের মধ্যে একদিন আমাদের সকলকে উৎসাহ দেয়ার জন্য নসীহত করলেন। নিজের নেগরানী নিজে করো। কানুন অন্ধের লাঠি স্বরূপ। যারা উস্তাদদের দেখানো পথে চলে তাদের জন্য কোন কানুনের প্রয়োজন নেই। কানুন শুধু তাদের জন্য যারা কানুনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর মেধা আর তোমাদের মেধার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু একসূয়ী তথা একাগ্রতার।

বিক্রমপুরী সাহেব হুযূরের দু'টি মূলনীতি

এক. রকমারী ফুলের রকমারী ঘ্রাণ। তুমি কেবল তোমার পছন্দসই ঘ্রাণই গ্রহণ করবে।

দুই. বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রতম স্বার্থকে বিসর্জন দিবে।

হুযূরের এই মূলনীতিদ্বয় 'আখলাকে হামীদা অর্জন এবং ইলমের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন' এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। তার এই ছোট ছোট কথার মর্ম যে কত গভীর তা আজ অনেকটা উপলব্ধি করতে পারছি।

পঞ্চম বছর : তারুণ্যের ঘাটে

জামাআতে কাফিয়া। বিদ্যা নিকেতনে আজ আমরা তারুণ্যের ভূমিকা পালন করছি। নেগরান হিসেবে পেয়েছি সরস মেজায ও বগুগ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান সাহেবকে। হুযূরের রসালো কথা-বার্তা, অভিনব উচ্চারণভঙ্গি এবং রকমারী কাব্য পংক্তি সারা বছর আমাদের প্রাণবন্ত করে রেখেছে। দরসের শেষদিন হুযূর সম্পূর্ণ পাল্টে গেলেন। একটুও হাসলেন না। মর্মস্পর্শী ভাষায় কিছু নসীহত করলেন। দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। আমাদেরও কাঁদালেন। হাত তুলে সকলের জন্য মঙ্গলের দু'আ করে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন। হুযূরের সেই অশ্রুমাখা চেহারাখানি আজ বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আর নিজের অজান্তেই কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

ষষ্ঠ বছর : তারুণ্যের দ্বিতীয় ঘাট

তারুণ্যের দ্বিতীয় বর্ষ। আমরা এখন শরহেজামীর ছাত্র। মুহাদ্দিস সাহেব রহ. এর দৌহিত্র হযরত আহমাদুল্লাহ সাহেব হুযূর আমাদের নেগরান। নিভৃতচারী, নীরব সাধক, দরসে ক্ষীণ-স্বর কিন্তু শ্রোতামাত্রই জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধ করবে। চুপ থাকার ক্ষেত্রে হুযূর একটি জীবন্ত নসীহত। হুযূরের জীবন পাতা থেকে রয়েছে অনেক কিছু শেখার এবং নেয়ার। কথা বলার সময় হুযূরের মুখের আকর্ষণীয় মিষ্টি হাসি হৃদয়ের আয়নায় বারবার ফুটে উঠছে।

দু'টি সুখের বার্তা

এক. দীর্ঘদিন মাদরাসায় পানি সঙ্কট চলছিল। গত বছর সাবমার্সিবল পাম্প বসানোয় পানির সঙ্কট কেটে গেল।

দুই. এ বছরই বসিলার স্বপ্নধারা হাউজিংয়ে 'মসজিদুল আবরারের' পাইলিং কাজ শুরু হয়।

সপ্তম বছর : তারুণ্যের শেষঘাট

হাঁটি হাঁটি পা-পা করে কখন যে শরহেবেকায়ায় উঠে গেলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এবার আমরা আবূ বকর সাহেব হুযূরের আদরে-শাসনে। হুযূর দীর্ঘদিন যাবত দু'টি আশা লালন করে আসছিলেন। একটি হজ্জ পালন, অপরটি দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে বিদেশ সফর। স্পেন সফরের মাধ্যমে হুযূরের দ্বিতীয় আশা পূর্ণ হয়েছে। যিয়ারতে বাইতুল্লাহর আশা হুযূরের এখনো অধরা। দু'আ করি আল্লাহ যেন তা পূর্ণ করে দেন (আমীন)। সাথে সাথে আমাদের অন্তরেও দীদারে কা'বার আশা ও দু'চোখে যিয়ারতে বাইতুল্লাহর স্বপ্ন দান করেন।

রাহমানিয়া টিনশেড-সংলগ্ন রাস্তা প্রশস্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। টিনশেডের মধ্যভাগ পর্যন্ত পড়েছে রাস্তার বর্ধিত সীমানায়। যেদিন বুলডোজার দিয়ে মাদরাসার সীমানা প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমাদের হৃদয়ও যেন বুলডোজারের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেল। সত্যিই সেদিন আমাদের হৃদয় ভেঙে চৌচির হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জোড়া লাগবার ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা করে দিলেন কল্পনাতীত চমৎকারভাবে। অতি অল্প সময়ে 'মসজিদুল আবরার'সহ দু'টি টিনশেডের কাজ সম্পন্ন হল। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। প্রথমে ইফতা, হাদীস ও হিফয বিভাগকে এবং পরবর্তীতে কিতাব বিভাগের চার জামাআতকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হল।

অষ্টম বছর : যৌবনের ঘাটে

শিক্ষাজীবনের যৌবন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। জালালাইন জামাআতটা আমাদেরকে বেলাশেষ হওয়ার সংবাদ দিল। এ বছর নেগরান হলেন হযরত কারী সাহেব হুযূর। হুযূর কানুনের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর, যেন হুযূরই কানুন।

বিশেষ তিনটি নসীহত

হুযূর আমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে অনেক দিকনির্দেশনামূলক নসীহত করতেন। তার মধ্যে তিনটি নসীহত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য-

এক. রাতে সঠিক সময় ঘুমিয়ে যাবে এবং শেষরাত্রে আগে আগে উঠবে।

দুই. সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং শুকনো কাপড় ভাঁজ করে রাখবে।

তিন. কখনো খানা নষ্ট করবে না। খানা নষ্ট করলে পরবর্তীতে রিযিকের অভাব দেখা দিবে।

নবম বছর : যৌবনের শেষ ঘাটে

শিক্ষাতরী বিদায়ের ঘাট ছুঁই ছুঁই। মিশকাত জামাআতে ওঠা মানেই 'বড়দের' খাতায় নাম লেখানো। অর্থাৎ এখন আমরা ছাত্রদের কাছে বড়ভাই হিসেবে পরিচিত। বড় হওয়া মানেই মায়ের কোল থেকে বিচ্ছেদ হওয়া। অর্থাৎ রাহমানিয়া আর বেশিদিন আমাদেরকে বুকে আগলে রাখবে না। আহরিত ইলমের নূর বিচ্ছুরণের লক্ষ্যে আমাদেরকে তার কোল থেকে পৃথক করে দিবে। এ বছর নেগরানীর দায়িত্বে আছেন খুলনার হুযূর ও বর্তমান নায়েবে মুহতামিম সাহেব। সুদীর্ঘ নয়টি বছর মনের কোণে এই আশা লালন করে আসছিলাম যে, শাহ আবরারুল হক রহ. এর দুই রূহানী সন্তানের দরসে শরীক হব। আল্লাহ তা'আলা এ আশা পূর্ণ করলেন। আনন্দে অশ্রুসিক্ত হলাম দরসের প্রথম দিনেই।

আধ্যাত্মিক রাহবার

মুফতী সাহেব হুযূর এবং মুমিনপুরী হুযূর হলেন জামি'আর প্রাণ। তাদের সকল চিন্তা-চেতনা জামি'আকে ঘিরে। প্রত্যেক মঙ্গলবার মুমিনপুরী হুযূর 'মাজালিসে আবরার' পড়ে শোনান এবং প্রত্যেক রবিবার মুফতী সাহেব হুযূর নামাযের ট্রেনিংসহ ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আত্মশুদ্ধির জন্য প্রতি মাসে একটি ইসলাহী মজলিস হয়। আত্মার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিটি মজলিসে বিরাজ করে আধ্যাত্মিকতার রওনক এবং অপার্থিব দ্যুতি।

কসরুল আশরাফ

এ বছরই ভিত্তি স্থাপিত হয় আবরারের নতুন ভবন 'কসরুল আশরাফ' এর। মাদরাসার কাজ শুরু উপলক্ষে এক দু'আ মাহফিলের আয়োজন হয়। এতে মূল্যবান নসীহত পেশ করেন আমীরে মজলিসে দাওয়াতুল হক মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব, ওলীপুরী হুযূর এবং আব্দুল গাফ্ফার সাহেব। বয়ান শেষে গভীর রাত্রে ছাত্র, উস্তাদ, বক্তা

এবং এলাকাবাসী সকলেই প্রস্তাবিত ভবনের জন্য হৃদয় উজাড় করে দু'আ করেন। সেদিন কান্নার তীব্রতায় মনে হচ্ছিল চোখের পানি দ্বারাই হবে আবরারের ভিত্তিপ্রস্তর। হে রব্বে কারীম! তুমি এ প্রতিষ্ঠানকে কিয়ামত পর্যন্ত মাকবুলিয়ত দান কর।

দশম বছর : বিদায়ের ঘাটে

দেখতে দেখতে শিক্ষাতরী বিদায়ের ঘাটে পৌঁছে গেছে। ক্ষণিক বাদেই অবতরণ করতে হবে এ তরী থেকে। বিদায় আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দু'হাত বাড়িয়ে অপেক্ষমান। আমাদের নেগরান মানিকগঞ্জী হুযূর। আধ্যাত্মিক জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যে অল্পসংখ্যক মানুষকে আল্লাহ তা'আলা গাম্ভীর্য ও মায়া-মমতার যুগপৎ দানে ধন্য করেছেন হুযূর তাদের অন্যতম।

অমূল্য নসীহত

হুযূর শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে একথা বলেন, الهمة هى الاسم الاعظم অর্থাৎ হিম্মতের নামই ইসমে আ'যম। তিনি আরো বলেন, হিম্মতে বান্দা মমদে খোদা। বান্দা হিম্মত করলেই আল্লাহ তার সাহায্য করেন। হুযূরের একটি নসীহতই জীবনের মোড় পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট।

সাবঊনের (سبعون) রহস্য

প্রিয় পাঠক!

আমাদের যাত্রার প্রারম্ভ হয়েছিল ৭০জন নিয়ে। আবার সমাপ্তিও ঘটছে ৭০জনেরই মাধ্যমে। আরবীতে ৭০ কে সাবঊন বলে। সাবঊন শব্দটি শুধু সত্তর সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে আধিক্য বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। আমাদের এ আধিক্য এবং সূচনা-সমাপ্তির এ জোড় যেন চিরকাল বহাল থাকে। অগ্রজ অনুজ সকলের কাছে এ দু'আ কামনা করি।

প্রিয় পাঠক!

বিদায় শব্দটি বড়ই নির্মম, বড়ই নির্দয়, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইলেও সে কাউকে ছাড়ে না। হৃদয় তন্ত্রীতে থেকে থেকে বিদায় বীণা বেজে উঠছে। অন্তরের বেলকনিতে কান্নারা বিরহের ঝঙ্কার তুলছে। খুদ্দামুত্তলাবার সমাপনী অনুষ্ঠানের পর থেকে মনটা খুব বেশি ভেঙ্গে পড়েছে। বিদায় নামের এ টর্নেডো বারবার আঘাত হানছে অন্তরের কোমলতম স্থানে। এরই মধ্যে জানিয়ে দেয়া হল খতমে বুখারীর তারিখ। এ যেন পূর্ণরূপে বিদায়ের সুরধ্বনি, বিচ্ছেদের হাতছানি। আরো বেদনাকাতর হয়ে পড়লাম।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ নায়েবে মুহতামিম সাহেবের নির্দেশে সকলে দরসগাহে সমবেত হলাম। সেখানে হুযূরসহ রাহমানিয়ার পাঁচজন সূর্যসন্তান উপবিষ্ট। তারা রাবেতা কি ও কেন এবং ফারাগাত-পরবর্তী জীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুবই মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরলেন। একপর্যায়ে তারা অশ্রুসজল হয়ে হৃদয়ের নির্যাসকে মুখনিসৃত বাণী দ্বারা এভাবে ব্যক্ত করলেন যে, রাবেতার মূল উদ্দেশ্য হল উস্তাদদের সঙ্গে ফারেগ ছাত্রদের সেতুবন্ধ স্থাপন করা। যেন তারা শিক্ষা সমাপনের পরও উস্তাদদের বাহুডোরে আবদ্ধ থেকে কর্মের ময়দানে সঠিকভাবে ওয়ারাসায়ে আম্বিয়ার যিম্মাদারী আঞ্জাম দিতে পারে। তারা এ কথাও বললেন, আমাদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হওয়ার দরুণ আমাদের ও আপনাদের মাঝে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও আমাদের সকলের উৎসমূল এক ও অভিন্ন। কারণ আমরা একই ঘাট থেকে পান করেছি এবং একই পেস্তান থেকে তৃপ্ত হয়েছি।

বড় ভাইদের এ সকল কথামালা ক্ষত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগিয়ে দিল। ফলে নিরাশার অমানিশায় খুঁজে পেলাম আশার আলো। বিচ্ছেদের মাঝে বন্ধনের সূত্র। যেন শিক্ষা সমাপ্তির পরেও আমরা উস্তাদদের বাহুডোরে আবদ্ধ।

নবীন প্রবীণ হে সুহৃদ অনুজেরা!

তোমরা অনেকেই রাহমানিয়ার প্রচণ্ড গরম আর তীব্র শীত এবং টিনের ফুটো দিয়ে কিতাব, বেডিং ভিজে যাওয়ার ইতিহাসের সাথে পরিচিত নও। আমরা অনেকেই পানি সঙ্কটের করুণ বাস্তবতার সম্মুখীন হইনি। আজকে ট্যাপযোগে যে পানির অবারিত ধারা এবং হাউজ উপচে পড়া পানি দেখছ, পাশাপাশি শীত মৌসুমে সকাল-বিকাল গরম পানির যে উষ্ণ পরশ লাভ করছ এ সবই বড় ভাইদের কুরবানীর ফসল। যে কুরবানী কিছুটা আমরাও পেশ করেছি। দিনের পর দিন পানি আসত না। উযূ-গোসলের জন্য ছুটে যেতাম বিভিন্ন মসজিদের হাম্মামখানায়, কখনোবা লালমাটিয়ার বড় পুকুরে। সুতরাং পানির প্রতিটি ফোঁটার কদর করো। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন কিংবা তার চেয়েও শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। এটা পবিত্র কুরআনের বাণী, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

প্রিয় রাহমানিয়া!

প্রথম যেদিন তোমার কোলে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেদিন থেকেই তুমি শপথ গ্রহণ করেছিলে– আমাদেরকে সুযোগ্য ওয়ারাসায়ে আম্বিয়া হিসেবে গড়ার, শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ধীমান ও বিদগ্ধ গবেষক, লেখনী ও কলম চালনার অঙ্গনে নির্ভরযোগ্য লেখক ও কলামিস্ট, উপস্থাপনা ও বক্তৃতার ময়দানে প্রাঞ্জল উপস্থাপক ও অনলবর্ষী বক্তা, দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের প্রাঙ্গণে দরদী দায়ী ও আদর্শ সমাজ সংস্কারক আর দাওয়াতুল হক তাযকিয়ার মহলে অন্তর্লোক সম্পন্ন মুসলিহ ও মুযাক্কী বানানোর বহুমুখী প্রয়াস গ্রহণ করেছো।

হে প্রিয়তম!

তুমি ত্যাগ, তিতিক্ষার যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছো তা মহাকালের মহাবিস্ময়।

রাহমানিয়া! আমরা তোমার উশ্‌শাকে আউয়ালীনের সর্বশেষ সন্তান। জীবনের একটি বড় অংশ পার করেছি তোমার বুকে মাথা রেখে। তোমার প্রতিটি ইট ও ধূলিকণার সাথে গড়ে উঠেছে আমাদের পরম সখ্যতা।

হে মাতৃতুল্য রাহমানিয়া! আমাদের উদ্ভট আচরণ ও উচ্চারণে কতবার তোমার নিমগ্ন ধ্যান ভেঙ্গেছে। আমাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ রফতার কতবার তোমাকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত । তুমি সব বরণ করে নিয়েছো হাসিমুখে। ললাটে তোমার কখনো দেখিনি অভিমানের মলিন ছাপ। তিরস্কারের পরিবর্তে শুনিয়েছো সান্ত্বনার বাণী। শত দুর্যোগ-মুসীবতে জড়িয়ে নিয়েছো মায়ার আঁচলে। আজ খুব মনে পড়ছে তোমার মহানুভবতার অম্লান সেই স্মৃতিগুলো। ফেলে আসা দিনগুলো একযোগে ভেসে উঠছে মনের পাতায়; ভিড় জমিয়েছে লিখনীর অগ্রভাগে। কিন্তু হায়! অশ্রুজল ছাড়া এক অক্ষম তালিব আর কী নিবেদন করবে তোমায়! বিদায় হে জননী! বিদায়!!